চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (اَلْاَخْلَاقُ)

আখলাক আরবি শব্দ। এটি বহুবচন। এক বচন খুলুকুন (خُلُقٌ)। এর আভিধানিক অর্থ- স্বভাব, চরিত্র, ইত্যাদি। শব্দগত বিবেচনায় আখলাক বলতে সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র উভয়কেই বোঝায়। তবে প্রচলিত অর্থে আখলাক শুধু সচ্চরিত্রকেই বুঝায়। যেমন ভালো চরিত্রের মানুষকে আমরা চরিত্রবান বলি। আর মন্দ চরিত্রের মানুষকে বলি চরিত্রহীন। ব্যবহারিক বিবেচনায় আখলাক দ্বারা ভালো ও উত্তম চরিত্রকে বোঝানো হয়।

মূলত আখলাক হলো মানুষের স্বভাবসমূহের সমন্বিত রূপ। মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, মানসিকতা, কর্মপন্থা সবকিছুকে একত্রে চরিত্র বা আখলাক বলা হয়। তা ভালো কিংবা মন্দ হতে পারে। এককথায়, মানুষের সকল কাজ ও নীতির সমষ্টিকেই আখলাক বলা হয়।

আখলাক দু'প্রকার। যথা-

ক. আখলাকে হামিদাহ (اَخْلَاقٌ حَمِيْدَةٌ)

খ. আখলাকে যামিমাহ (اَخْلَاقٌ ذَمِيْمَةٌ)

আখলাকে হামিদাহ হলো মানুষের প্রশংসনীয় গুণাবলি আর আখলাকে যামিমাহ মানব স্বভাবের মন্দ অভ্যাসগুলোর সামষ্টিক নাম। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে এ দু'প্রকার আখলাকের পরিচয়, গুরুত্ব, কুফল এবং কতিপয় ভালো ও মন্দ চরিত্র সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- আখলাকের ধারণা, প্রকার ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- কতিপয় সদাচরণ (আখলাকে হামিদাহ) এর পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- তাকওয়ার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ওয়াদা পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সত্যবাদিতার ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- শালীনতার ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- আমানতদারির পরিচয়, আমানত রক্ষার উপায় ও আমানতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইসলামে মানবসেবার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা ও সুফল বর্ণনা করতে পারব;
- ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- ইসলামে পরিচ্ছন্নতার ধারণা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মিতব্যয়িতার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;

- আত্মশুদ্ধির ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কতিপয় অসদাচরণ (আখলাকে যামিমাহ) এর পরিচয় ও এর কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- প্রতারণার ধারণা ও এর কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গিবত ও পরনিন্দার ধারণা ও এর কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হিংসা-বিদ্বেষের ধারণা ও এর কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- ফিতনা-ফাসাদের পরিচয় ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কর্মবিমুখতা ও অলসতার কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- সুদ ও ঘুষের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজ জীবনে অসদাচরণ পরিহার ও সদাচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১

আখলাকে হামিদাহ

পরিচয়

আখলাক অর্থ চরিত্র, স্বভাব। আর হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয়। সুতরাং আখলাকে হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র, সচ্চরিত্র। ইসলামি পরিভাষায়, যেসব স্বভাব বা চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স.)-এর নিকট প্রিয় সেসব স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়।

এককথায়, মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়। মানুষের সার্বিক আচার-আচরণ যখন শরিয়ত অনুসারে সুন্দর, সুষ্ঠু ও কল্যাণকর হয় তখন সে স্বভাব-চরিত্রকে বলা হয় আখলাকে হামিদাহ।

আখলাকে হামিদাহকে আখলাকে হাসানাহ বা হুসনুল খুলুকও বলা হয়। আখলাকে হাসানাহ অর্থ সুন্দর চরিত্র। মানব চরিত্রের উত্তম ও নৈতিক গুণাবলি আখলাকে হামিদাহ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- সততা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, মানব সেবা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি।

গুরুত্ব

আখলাকে হামিদাহ মানবীয় মৌলিক গুণ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর দ্বারাই মানুষ পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হয়। মানবিকতা ও নৈতিকতার আদর্শ আখলাকে হামিদাহর মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। মানুষের ইহ ও পরকালীন সুখ, শান্তি উত্তম আখলাকের উপরই নির্ভরশীল। সৎচরিত্রবান ব্যক্তি যেমন সমাজের চোখে ভালো তেমনি মহান আল্লাহর নিকটও প্রিয়। মহানবি (স.)-এর হাদিসে বলা হয়েছে-

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

অর্থ : "আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই লোকই অধিক প্রিয়, চরিত্রের বিচারে যে উত্তম।" (ইবনে হিব্বান)

এ জন্য মানুষকে আখলাক শিক্ষা দেওয়াও নবি-রাসুলগণের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সব ধরনের সৎগুণ তাঁর চরিত্রে পাওয়া যায়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন-

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

অর্থ : "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ধারক।" (সূরা আল কালাম, আয়াত ৪)

রাসুলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ -

অর্থ : "উত্তম চারিত্রিক গুণাবলিকে পূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (বায়হাকি)

রাসুলুল্লাহ (স.) নিজে যেমন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তেমনি মানবজাতিকে সচ্চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়ার জন্য তিনি সৎ ও নৈতিক স্বভাব অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "মুমিনগণের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের বিচারে সবচেয়ে উত্তম।" (তিরমিযি)

প্রকৃতপক্ষে সৎচরিত্র পরকালীন জীবনেও মানুষের কল্যাণের হাতিয়ার, মুক্তির উপায় হবে। উত্তম আচার-আচরণ মানুষকে পুণ্য বা সাওয়াব দান করে। মহানবি (স.) বলেছেন, اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ

অর্থ : "সুন্দর চরিত্রই পুণ্য।" (মুসলিম)

প্রশংসনীয় আচরণ ও স্বভাব কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লা ভারী করবে। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) মিযানে সুন্দর চরিত্র অপেক্ষা ভারী বস্তু আর কিছুই থাকবে না।" (তিরমিযি)

দুনিয়ার জীবনেও আখলাকে হামিদাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সমাজের সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায়। তাঁর বিপদে-আপদে এগিয়ে আসে।

চরিত্রের কারণে তিনি সমাজে মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহানবি (স.) এ সম্পর্কে বলেছেন,

خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا-

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ সকল ব্যক্তি, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্র বিচারে সুন্দরতম।" (বুখারি)

সমাজের সকলে চরিত্রবান হলে সেখানে কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি থাকে না। সমাজ সুখে-শান্তিতে ভরে ওঠে।

সৎচরিত্র আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। দুনিয়ায় আগত সকল নবি-রাসুলই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়াও পৃথিবীর স্মরণীয় ও বরণীয় মনীষীগণও উত্তম নৈতিক আদর্শ অনুশীলন করতেন। সৎচরিত্রের মাধ্যমেই ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এজন্য ইসলামে আখলাকে হামিদাহ অর্জনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

শিক্ষা : শিক্ষার্থী আখলাকে হামিদাহর পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজে খাতায় লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২

তাকওয়া

পরিচয়

তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। ব্যবহারিক অর্থে পরহেজগারি, খোদাভীতি, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বোঝায়। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। অন্যকথায় সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ্ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলা হয়। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাঁকে বলা হয় মুত্তাকি।

মহান আল্লাহকে ভয় করার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। তিনি আমাদের সবকিছু দেখেন, জানেন। তিনি শাস্তিদাতা ও মহাপরাক্রমশালী। হাশরের দিনে তিনি আমাদের সকল কাজের হিসাব নেবেন। অতঃপর পাপকাজের জন্য শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্-ভীতি হলো আল্লাহ্ তায়ালার সামনে জবাবদিহি করার ভয়। অতঃপর এরূপ অনুভূতি মনে ধারণ করে সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হয়। সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অশ্লীল কথা-কাজ ও চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকতে হয়। আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করলে এসব পাপ থেকে সহজেই বেঁচে থাকা যায়। ফলে মুত্তাকিগণ পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করবে ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকবে, তার স্থান হবে জান্নাত।" (সূরা আন-নাযিআত, আয়াত ৪০-৪১)

গুরুত্ব

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনকেই সম্মান-মর্যাদা ও সফলতা দান করে। ইসলামি জীবন দর্শনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন মুত্তাকিগণ। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাকওয়ার মূল্য অত্যধিক। ধন-সম্পদ, শক্তি-ক্ষমতা, গাড়ি-বাড়ি থাকলেই মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বরং যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করতে পারেন সেই আল্লাহ্ তায়ালার নিকট বেশি মর্যাদাবান। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।" (সূরা আত্ তাওবা, আয়াত ৪)

পার্থিব জীবনে মুত্তাকিগণ আল্লাহ্ তায়ালার বহু নিয়ামত লাভ করে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকওয়াবানদের সর্বদা সাহায্য করেন। বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন ও বরকতময় রিযিক দান করেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ্ তার পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন।" (সূরা আত্-তালাক, আয়াত ২-৩)

পরকালেও তাকওয়াবানদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মুত্তাকিদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং মহাসফলতা দান করবেন। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর (আল্লাহকে ভয় কর) তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়।" (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ২৯)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই মুত্তাকিগণের জন্য রয়েছে সফলতা।" (সূরা আন্-নাবা, আয়াত ৩১)

প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া মানব চরিত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব। এর মাধ্যমে মানুষ সম্মান, মর্যাদা ও সফলতা লাভ করে।

নৈতিক জীবনে তাকওয়ার প্রভাব

নৈতিক জীবন গঠনে ও নীতি-নৈতিকতা রক্ষায় তাকওয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাকওয়া সকল সৎগুণের মূল। ইসলামি নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া। তাকওয়া মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে উদ্বুদ্ধ করে। হারাম বর্জন করতে এবং হালাল গ্রহণ করতে প্রেরণা যোগায়। মুত্তাকি ব্যক্তি সদাসর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন, শোনেন, জানেন, এ বিশ্বাস পোষণ করেন। ফলে তিনি কোনোরূপ অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করতে পারেন না। কোনোরূপ অশ্লীল ও অশালীন কথা, কাজ ও চিন্তাভাবনা করতে পারেন না। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পাপ যত গোপনেই করা হোক না কেন, আল্লাহ তায়ালা তা দেখেন ও জানেন। কোনোভাবেই আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাকওয়াবান ব্যক্তি সকল কাজেই নীতি-নৈতিকতা অবলম্বন করেন এবং অনৈতিকতা ও অশ্লীলতা পরিহার করেন।

তাকওয়া মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে। সকল সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। ফলে মুত্তাকিগণ সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হন। অন্যদিকে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল হতে পারে না। সে নানা অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত থাকে। নৈতিক ও মানবিক আদর্শের পরোয়া করে না। ফলে তার দ্বারা সমাজে অনৈতিকতা ও অপরাধের প্রসার ঘটে।

বস্তুত তাকওয়া হলো মহৎ চারিত্রিক গুণ। নৈতিক চরিত্র গঠনে এর কোনো বিকল্প নেই। আমরা সকলেই তাকওয়াবান হওয়ার চেষ্টা করব।

কাজ : তাকওয়ার পরিচয়, গুরুত্ব ও নৈতিক জীবনে তাকওয়ার প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান অর্জন করল তা শ্রেণিতে দাঁড়িয়ে শিক্ষককে শোনাবে।

পাঠ ৩

ওয়াদা পালন

পরিচয়

ওয়াদাকে আরবি ভাষায় বলা হয় আল-আহ্দু (اَلْعَهْدُ)। আল-আহ্দু এর শাব্দিক অর্থ- ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, কাউকে কোনো কথা দেওয়া বা কোনো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও

সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে।

গুরুত্ব

ওয়াদা পালন আখলাকে হামিদাহ্র অন্যতম গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ওয়াদা পালন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে তাকে সবাই ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে। ইসলামি জীবন দর্শনে ওয়াদা পালন করা আবশ্যক। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ

অর্থ: "হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ১)

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ○

অর্থ: "তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৩৪)

প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা পালন করা অত্যাবশ্যক। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে।

ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সৎ ও নৈতিক গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিগণ সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন,

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ -

অর্থ: "যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দীন নেই।" (মুসনাদে আহমাদ)

আমাদের প্রিয়নবি (স.) সর্বদাই ওয়াদা পালন করেছেন। সাহাবি এবং আউলিয়া কেরামের জীবনী পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা জীবনে কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। কেননা ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের নিদর্শন। মুনাফিকরা ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করে না। আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের এরূপ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মুমিন-মুসলমানের নিদর্শন হলো তারা ওয়াদা পালন করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা পালন করো না এমন কথা কেন বলো?" (সূরা আস-সাফ, আয়াত ২)

সুতরাং কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করলে বা চুক্তি সম্পাদন করলে তা পূর্ণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি-সফলতা লাভ করা যাবে।

কাজ: শিক্ষার্থী ওয়াদা পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজ খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

সত্যবাদিতা

পরিচয়

সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস-সিদ্ক। সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। অন্যকথায়, বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সিদ্ক বলা হয়। অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ব্যতিরেকে হুবহু বা অবিকল বর্ণনা করাই হলো সিদ্ক। যে ব্যক্তি সত্যবাদী তাকে বলা হয় সাদিক (صَادِقٌ)। আর মহাসত্যবাদীকে সিদ্দিক (صِدِّيْقٌ) বলে।

সত্যবাদিতার বিপরীত হলো মিথ্যাচার। কোনো ঘটনা বা বিষয়কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হলো মিথ্যাচার। মিথ্যাচারকে আরবিতে কিযব (اَلْكِذْبُ) বলে। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তাকে বলা হয় কাযিব (اَلْكَاذِبُ) আর চরম মিথ্যাবাদী হলো কায্যাব (اَلْكَذَّابُ)।

গুরুত্ব

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে সত্যবাদিতা ও সততা অবলম্বন করলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। সদা সর্বদা সত্য, সুন্দর ও সঠিক কথা বলা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। তিনি বলেন,

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○

অর্থ : "হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সঠিক কথা বলো।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৭০)

মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী মুমিনগণের একটি অন্যতম নিদর্শন হলো তাঁরা সত্যবাদী। জীবনের সর্বাবস্থায় তাঁরা সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করেন। শুধু নিজে নিজে সত্য বলার চর্চা করলেই হবে না বরং সত্যবাদীদের সাথে সুসম্পর্ক থাকতে হবে। এতে সমাজে সার্বিকভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সত্যবাদীদের সাথি হও।" (সূরা আত-তওবা, আয়াত ১১৯)

প্রকৃত মুমিন অবশ্যই সত্যবাদী হবেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করেছেন। তাঁর সাথি হযরত আবু বকর (রা.)ও ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। তাই হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলা হয় সিদ্দিক।

যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে তাকে সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী তাকে কেউ ভালোবাসে না, সম্মান করে না। বরং সকলেই তাকে ঘৃণা করে। কেননা মিথ্যা বলা মহাপাপ। এটি সকল পাপের মূল। মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ তায়ালা চরম অসন্তুষ্ট।

প্রভাব ও পরিণতি

মানবজীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব সীমাহীন। সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রক্ষা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি কোনোরূপ অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে না। একটি হাদিসে আমরা এর প্রমাণ পাই। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একদা জনৈক ব্যক্তি মহানবি (স.)-এর নিকট এসে বলল, 'আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি এবং আরও অনেক খারাপ কাজ করি। সবগুলো খারাপ কাজ একসঙ্গে ত্যাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

আপনি আমাকে যেকোনো একটি খারাপ কাজ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিন।' মহানবি (স.) বললেন, "তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।" লোকটি বলল, এ তো খুব সহজ কাজ। মহানবি (স.)-এর কথামতো লোকটি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিল। পরে দেখা গেল যে, মিথ্যা বলা ত্যাগ করায় তার পক্ষে আর কোনো খারাপ কাজ করা সম্ভব হলো না। সে সবগুলো খারাপ কাজ ছেড়ে দিল। কেননা সে ভাবল, কেউ তাকে অপরাধের কথা জিজ্ঞেস করলে সে মিথ্যা বলতে পারবে না। বরং স্বীকার করতে হবে। এতে সে লজ্জিত হবে ও শাস্তি ভোগ করবে। এভাবে শুধু মিথ্যা ত্যাগ করায় লোকটি সকল খারাপ কাজ থেকে মুক্তি পেল। সত্যবাদিতা এভাবেই মানুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে।

সত্যবাদিতার পরিণতি হলো সফলতা ও মুক্তি। যেমন বলা হয়,

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ-

অর্থ : "সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।"

সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত হয়, মর্যাদা লাভ করে। আর আখিরাতে সত্যবাদিতার প্রতিদান হলো জান্নাত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ

অর্থ : "এ তো সেই দিন, যে দিন সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দান করবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ১১৯)

মহানবি (স.) বলেন, "তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।" (বুখারি ও মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে আছে, একবার মহানবি (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী আমল করলে জান্নাতবাসী হওয়া যায়? তিনি উত্তরে বললেন, "সত্য কথা বলা।" (মুসনাদে আহমাদ)

সত্যবাদিতা নৈতিক গুণাবলির অন্যতম প্রধান গুণ। এটি মানুষকে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা দান করে। সুতরাং আমাদের সকলেরই সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হওয়া একান্ত কর্তব্য।

কাজ : শিক্ষার্থী সত্যবাদিতার উপর ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫

শালীনতা

শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলা হয়। গর্ব-অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও অশ্লীলতা ত্যাগ করে জীবনাচরণের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি নীতি-আদর্শের অনুসারী হওয়ার দ্বারা শালীনতা অর্জন করা যায়।

শালীনতার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি বহু নৈতিক গুণের সমষ্টি। ভদ্রতা, নম্রতা, সৌন্দর্য, সুরুচি, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বিত রূপের মাধ্যমে শালীনতা প্রকাশ পায়। অশ্লীলতা হলো শালীনতার বিপরীত। গর্ব-অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, কুরুচি ও কুসংস্কার শালীনতাবিরোধী অভ্যাস। এগুলো থেকে বেঁচে থাকাই শালীনতা অর্জনের উপায়।

শালীনতার গুরুত্ব

ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম। এটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুরুচিপূর্ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। মার্জিত, নম্র, ভদ্র ও পূত-পবিত্র হিসেবে মানুষকে গড়ে তোলা ইসলামি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এ লক্ষ্যে শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। বলা যায় শালীনতাই হলো ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

ইসলাম সকল মানুষকেই নম্র, ভদ্র ও শালীন হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। যেসব কাজ শালীনতাবিরোধী, ইসলামে সেসব কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা অশ্লীল ও অশালীন কাজকর্ম মানুষের মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দেয়। মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের অভ্যাস গ্রহণ করে। ফলে সমাজে অনাচার, ব্যভিচার, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ভেঙে দেয়। যার কারণে সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও চলাফেরায় শালীনতার অভাব অনেক সময় সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়। ইভটিজিং, ব্যভিচার ইত্যাদির জন্ম হয়। এজন্য ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দা রক্ষা ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আর তোমরা (নারীরা) নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহিলি যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৩)

অতএব, বিনা প্রয়োজনে অশালীনভাবে নারীদের বাইরে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। বরং প্রয়োজনে বাইরে গেলে পর্দা ও শালীনতা অবলম্বন করে যেতে হবে। পুরুষদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তাদেরকেও অবশ্যই শালীনভাবে সমাজে বিচরণ করতে হবে।

পূত-পবিত্রতা ও শালীনতার অন্যতম বিষয় হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে। লজ্জাশীলতার ফলে মানুষ পরকালীন সফলতা লাভ করবে। মহানবি (স.) বলেন, اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

অর্থ : "লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময়।" (মুসলিম)

মহানবি (স.) আরও বলেন, اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ অর্থ : "লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা।" (সুনানে নাসাই)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, "অশ্লীলতা যেকোনো জিনিসকে খারাপ করে এবং লজ্জাশীলতা যেকোনো জিনিসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।" (তিরমিযি)

সুতরাং চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার-আচরণে লজ্জাশীল হওয়া প্রয়োজন। সর্বাবস্থায় রুচিসম্মত, ভদ্র, সুন্দর ও মার্জিত গুণাবলির অনুসরণ করার দ্বারা শালীনতা চর্চা করা যায়। শালীনতার ফলে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, আমরা সকল কাজে শালীনতা রক্ষা করব। অশ্লীল ও অশালীন কাজ ত্যাগ করব।

কাজ : শিক্ষার্থী শালীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

আমানত

পরিচয়

আমানত আরবি শব্দ। এর অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। তবে ব্যাপকার্থে শুধু ধন-সম্পদ নয় বরং যেকোনো জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। একজনের জান, মাল, সম্মান, কথা-প্রতিজ্ঞা সবকিছুই অন্যের নিকট আমানত স্বরূপ। যিনি গচ্ছিত সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন এবং তা প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেন তাকে বলা হয় আমিন বা আমানতদার।

আমানতের বিপরীত হলো খিয়ানত। খিয়ানত অর্থ আত্মসাৎ করা, ক্ষতিসাধন করা, ভঙ্গ করা। আমানতকৃত দ্রব্য বা বিষয় যথাযথভাবে প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে না দিয়ে আত্মসাৎ করাকে খিয়ানত বলে। যে ব্যক্তি গচ্ছিত জিনিসের খিয়ানত করে তাকে খায়িন (اَلْخَائِنُ) বলা হয়।

আমানত রক্ষার গুরুত্ব

আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহ্-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সচ্চরিত্র ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারি বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকে। আমানত রক্ষা করা আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৮)

আমানত রক্ষা করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই আমানতের খিয়ানত করে না। মহানবি (স.) বলেছেন, لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ

অর্থ : "যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।" (মুসনাদে আহমাদ)

আমানত রক্ষা করা ইমানের অঙ্গ স্বরূপ। আমানতের খিয়ানত করা ইমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটি মুনাফিকের চিহ্ন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন আমানতদারির মূর্ত প্রতীক। ঘোর শত্রুরাও তাঁকে আমানতদার হিসেবে জানত, তাঁর নিকট তাদের মূল্যবান ধন-সম্পদ আমানত রাখত। তাঁকে তারা আল আমিন বা বিশ্বাসী তথা আমানতদার নামে ডাকত। রাসুলুল্লাহ (স.)ও সারাজীবন আমানত রক্ষা করে চলেছেন। এমনকি হিজরতের সময় মক্কার কাফিররা যখন তাঁকে হত্যা করতে বের হয় তখনও তিনি আমানতের কথা ভোলেননি। তিনি তাদের গচ্ছিত সম্পদ প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইসলামি জীবন দর্শনে আমানত রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমানতের খিয়ানত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, হারাম। মহানবি (স.)-এর হাদিসে এসেছে খিয়ানত করা মুনাফিকদের অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ। আল্লাহ্ তায়ালা খিয়ানতকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ○

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৫৮)

খিয়ানত মানুষের পার্থিব জীবনেও বিপর্যয় ডেকে আনে। মহানবি (স.) বলেছেন, "আমানতদারি সচ্ছলতা ও খিয়ানত দারিদ্র্য ডেকে আনে।" (মুসনাদে শিহাব আল-কাযায়ি)

খিয়ানতকারী মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে। লোকেরা তাকে ঘৃণা করে। এড়িয়ে চলে। তার সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য,

লেনদেন করতে আগ্রহী হয় না। ফলে খিয়ানতকারী আর্থিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমানতের ক্ষেত্র

কারও নিকট কোনো দ্রব্য বা জিনিস গচ্ছিত রাখা হলে তা অবশ্যই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। গচ্ছিত দ্রব্যে কোনোরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। তা নিজ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং প্রকৃত মালিক যখন চাইবে তখনই তা ফিরিয়ে দিতে হবে। এটাই আমানতের ইসলামি নীতি ও পদ্ধতি।

আমানতের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। শুধু ধনসম্পদই আমানত নয়, বরং কথা, কাজ, মান-সম্মানও আমানত হতে পারে। মহানবি (স.) বলেছেন, "যখন কোনো লোক কথা বলে প্রস্থান করে, তখন সে কথাও এক প্রকার আমানত স্বরূপ।" (আবু দাউদ)

অর্থাৎ কেউ বিশ্বাস করে কোনো কথা বললে এবং তা গোপন রাখতে বললে সে কথাও আমানত স্বরূপ। সে কথা অন্যের নিকট বলে ফেললে আমানতের খিয়ানত করা হয়।

ইসলামে মানুষের প্রতিটি দায়িত্ব ও কর্তব্যই আমানত স্বরূপ। ব্যক্তিগত কাজের পাশাপাশি মানুষকে আরও বহু দায়িত্ব পালন করতে হয়। মানুষের এসব পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমানত হিসেবে গণ্য। নিম্নে আমানতের কতিপয় ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো-

১. মাতাপিতার নিকট সন্তান আমানত স্বরূপ। সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করা, তাদের সুশিক্ষা দিয়ে বড় করে তোলা তাদের দায়িত্ব।

২. সন্তানের নিকট মাতাপিতা আমানত। মাতাপিতার আনুগত্য করা, তাঁদের সেবা করা সন্তানের কর্তব্য ও আমানত।

৩. শিক্ষকের নিকট ছাত্র-ছাত্রী আমানত। তাদের সুশিক্ষা দেওয়া আমানত স্বরূপ।

৪. ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিদ্যালয়ের সব আসবাবপত্র আমানত। এগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের কর্তব্য। শিক্ষকদের সম্মান করা, সুন্দরভাবে পড়াশুনা করা ইত্যাদিও শিক্ষার্থীদের নিকট আমানত স্বরূপ।

৫. কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠান আমানত স্বরূপ। ঐ প্রতিষ্ঠানের সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের কর্তব্য।

৬. সরকারের নিকট রাষ্ট্রের সকল সম্পদ ও জনগণের অধিকার আমানত স্বরূপ। এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার না করা খিয়ানত হিসেবে গণ্য।

৭. জনগণের নিকট রাষ্ট্র আমানত স্বরূপ। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা, জাতীয় উন্নয়নের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় করা খিয়ানত হিসেবে গণ্য।

আমানত একটি মহৎগুণ। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে মানুষ আমানত রক্ষা করতে পারে। আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আমানত রক্ষা করতে সচেষ্ট হব।

কাজ : শিক্ষার্থী আমানত রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

মানবসেবা

পরিচয়

মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি বোঝায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত।

মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কর্তব্য হলো এসব সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া ও তাদের সাথে যথাযথ ব্যবহার করা। পাশাপাশি অন্য মানুষের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করাও মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। কেননা পরস্পরের সেবা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

ইসলামে সবরকমের হক বা অধিকার দু'ভাগে বিভক্ত। তাহলো হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ। হাক্কুল্লাহ হলো আল্লাহ তায়ালার হক। সব রকমের ইবাদত, প্রশংসা, তাসবিহ-তাহলিল এর অন্তর্ভুক্ত। আর হাক্কুল ইবাদ হলো বান্দার হক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসা, সকলের সেবা করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা হাক্কুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। মানবসেবা হলো হাক্কুল ইবাদের অন্যতম দিক।

গুরুত্ব

মানবসেবা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম বিষয়। মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন তিনি মহৎপ্রাণ। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও এরূপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন আল্লাহ তায়ালাও তাঁকে সাহায্য ও দয়া করেন। মহানবি (স.) বলেন, لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ - অর্থ : "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।" (বুখারি)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ

অর্থ : "তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (তিরমিযি)

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তাকে সাহায্য করতে থাকেন।" (মুসলিম)

বস্তুত, সকল মানুষ ভাই ভাই। সকলেই আদম (আ.)-এর সন্তান। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের সাহায্য করে আল্লাহ তায়ালাও সে ব্যক্তির সাহায্য করেন, তার বিপদাপদ দূর করেন।

মানবসেবা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। মহানবি (স.) এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং ঋণ-গ্রস্তকে ঋণমুক্ত কর।" (বুখারি)

নানাভাবে মানুষের সেবা করা যায়। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অসহায়কে আশ্রয় দান, রোগীর সেবা করা, নিঃস্ব-দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য করার মাধ্যমে মানবসেবা করা যায়। ছোট ও বৃদ্ধদের সাহায্য করা, দয়া-মায়া-মমতা প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখানো মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত।

মানবসেবার প্রতিদান সীমাহীন। আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মানুষের সেবাকারীকে প্রভূত পুরস্কার ও নিয়ামত দান করবেন। মহানবি (স.) বলেন, "কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় দান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের পোশাক দান করবেন। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল দান করবেন। কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করালে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সিলমোহরকৃত পাত্র থেকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।" (আবু দাউদ)

আমাদের প্রিয় নবি (স.) মানবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ছোট-বড়, ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করতেন, সকলের খোঁজ খবর নিতেন। বিপদগ্রস্ত, অভাবীদের সহায়তা করতেন। তাঁর দয়া, মায়া ও সহানুভূতি থেকে তাঁর চরম শত্রুও বঞ্চিত হতো না। রাসুল (স.)-এর জীবনী পাঠ করলে আমরা এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। রাসুল (স.)-কে কষ্টদানকারী বুড়ির ঘটনা আমরা সবাই জানি। এক কাফির বৃদ্ধা প্রতিদিন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। এতে মহানবি (স.)-এর পথ চলতে কষ্ট হতো। তারপরও তিনি বুড়িকে কিছু বলতেন না। একদিন তিনি পথে কাঁটা দেখলেন না। দয়ালু নবি (স.) ভাবলেন, নিশ্চয়ই বুড়ি অসুস্থ। এজন্য পথে কাঁটা দিতে পারেনি। তিনি খুঁজে বুড়ির বাড়ি গেলেন। গিয়ে দেখলেন বুড়ি সত্যিই অসুস্থ। তার সেবা করারও কেউ নেই। নবিজি (স.) বুড়ির শিয়রে বসলেন। তার সেবা-যত্ন করলেন। ফলে বুড়ি ভালো হয়ে উঠল। সে তার অপকর্মের জন্য লজ্জিত হলো। সে আর কোনোদিন পথে কাঁটা দেয়নি।

সকল মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করে গেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত যথাসম্ভব সকল মানুষের সেবা করা।

কাজ : সব শিক্ষার্থী একত্রে বসে একজনকে আলোচক মনোনীত করবে। সে মানবসেবার পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে। আর সকলে তা শুনবে। শিক্ষক সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

পাঠ ৮

ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ভ্রাতৃত্ববোধ হলো ভ্রাতৃত্বসুলভ অনুভূতি প্রকাশ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে ভাইয়ের ন্যায় মনে করা, ভ্রাতৃসুলভ আচার-আচরণ করা। সহোদর ভাইয়ের সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করি, সবসময় তাদের কল্যাণ কামনা করি, তাদের জন্য নিজেদের নানা স্বার্থ ত্যাগ করি, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসি। তেমনিভাবে দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি এরূপ মনোভাব পোষণ ও নিজ কর্মের মাধ্যমে এর প্রমাণ উপস্থাপনই হলো ভ্রাতৃত্ববোধ।

আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালোবাসা। আমাদের সমাজে বহু ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির লোক বাস করে। তারা এক একটি সম্প্রদায়। সমাজে বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজ জীবনে যথাযথভাবে এগুলোর অনুশীলন করে থাকেন।

ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। এতদুভয়ের অনুপস্থিতিতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, জাতির উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়, এমনকি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়।

ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করে, মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। ফলে মানব সমাজে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকলে মানুষ একে অন্যকে ভালোবাসে না, অন্যের কল্যাণ কামনা করে না। বরং নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতন করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। মানুষ একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখে। বিভিন্ন ধর্মের, জাতির ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বসবাসের ফলে দেশীয় সভ্যতাও উন্নততর হয়। সকলের প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে দেশে মারামারি হানাহানির সূত্রপাত ঘটে। অনেক সময় গৃহযুদ্ধও শুরু হয়। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। বস্তুত দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য উপাদান।

ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। এর সকল শিক্ষা ও আদর্শ মানবজাতির জন্য চির কল্যাণকর। এজন্য ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও ইসলাম সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে। ইসলামে এতদুভয় বৈশিষ্ট্য ও গুণ অনুশীলনের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ইসলামে সকল মুসলমান ভাই ভাই। মুসলমানগণ বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক, সে কালো হোক বা সাদা, ধনী হোক কিংবা গরিব সকলেই ভাই-ভাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থ : "মুমিনগণতো পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১০)

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ

অর্থ : "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।" (বুখারি)

বিশ্বের সকল মুসলমান ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তারা পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। একটি হাদিসে মহানবি (স.) মুসলমানদের এ ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "তুমি মুমিনগণকে পারস্পরিক করুণা প্রদর্শন, সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ কষ্ট পায় তখন গোটা দেহই জ্বর ও নিদ্রাহীনতার মাধ্যমে এর প্রতি সাড়া দেয়।" (বুখারি ও মুসলিম)

মুসলমানদের এ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব হলো ইসলামি ভ্রাতৃত্ব। ফলে দুনিয়ার দূরতম প্রান্তে কোনো মুসলমান কষ্টে পতিত হলে অন্য মুসলমানও তার সমব্যথী হয়, তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

মুসলমানগণের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি ইসলাম আরও এক প্রকার ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা প্রচার করেছে। এটি হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ব। অর্থাৎ ইসলামের মতে, বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই। এতে দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই। বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ ভ্রাতৃত্ব হলো মানুষের মৌলিক ভ্রাতৃত্ব। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। কোনো মানুষই এ ভ্রাতৃত্ববোধ লঙ্ঘন করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ

অর্থ : "হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

মহানবি (স.) বলেছেন, وَالنَّاسُ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ

অর্থ : "সকল মানুষই আদম (আ.)-এর বংশধর, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।" (তিরমিযি)

প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীতে সব মানুষ আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। এ হিসেবে সকল মানুষই একই বংশের, একই মর্যাদার ও পরস্পর ভাই-ভাই।

সুতরাং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতে হবে। সকলকে ভাইয়ের মমতায় দেখতে হবে, বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে, অন্য ধর্ম বা অন্য জাতি বলে কোনো মানুষের প্রতি অবিচার করা যাবে না। বরং সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সকল মানুষের মূলই এক এবং সৃষ্টিগতভাবে সকলেই ভাই-ভাই।

ইহকালীন শান্তির জন্য ভ্রাতৃত্ববোধের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বজায় রাখা অপরিহার্য। সমাজে বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। নিজ সম্প্রদায়ের বাইরের অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সাথেও সদাচরণ করতে হবে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। তাদের বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে। পারস্পরিক মারামারি হানাহানির পরিবর্তে শান্তি স্থাপনে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ আছে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তাতে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে এরূপ করবে আমি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দান করব।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৪)

মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন।

আমরা মুসলমান। আমাদের সমাজে অমুসলিম সম্প্রদায়ের বহু লোক বসবাস করেন। এদের কেউ আমাদের সহপাঠী, কেউ সহকর্মী, কেউ খেলার সাথি, কেউবা প্রতিবেশী আবার কেউ শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন। তাদের সকলের সাথেই ভালো ব্যবহার করতে হবে। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। মহানবি (স.) বলেছেন,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ-

অর্থ : "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।" (বায়হাকি)

অমুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে না। ধর্ম পালনে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

অর্থ : "তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।" (সূরা আল-কাফিরুন, আয়াত ৬)

অন্য আয়াতে এসেছে, لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

অর্থ : "দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৬)

ধর্মীয় স্বাধীনতা দানের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। এ জন্য তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়,

অত্যাচার করা যাবে না, তাদের সম্পদ দখল করা যাবে না। বরং তাদের জান-মাল-ইজ্জত সংরক্ষণ করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) এ বিষয়ে মুসলিমগণকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।" (বুখারি)

অন্য হাদিসে তিনি বলেন, "সাবধান! যে ব্যক্তি, কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে কোনো কাজ চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার কোনো সম্পদ নিয়ে যায় তবে কিয়ামতের দিন আমি সে ব্যক্তির প্রতিবাদকারী হব।" (অর্থাৎ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব)। (আবু দাউদ)

ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য নানা বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেছে। আমাদের উচিত জীবনের সকল অবস্থায় এসব নির্দেশ অনুশীলন করা। ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক সম্প্রীতির আদর্শে সকলে পরিচালিত হলে এ গোটা বিশ্ব শান্তিময় হয়ে উঠবে।

কাজ : সব শিক্ষার্থী একত্রে বসবে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে চারজন শিক্ষার্থীকে বক্তা নির্ধারণ করবে। তারা ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে বক্তৃতা করবে। শিক্ষক সভাপতি ও সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করবেন। যার বক্তৃতা সবচেয়ে ভালো হবে তাকে সকলে অভিনন্দন জানাবে।

পাঠ ৯

নারীর প্রতি সম্মানবোধ

নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম। এটি একটি মহৎগুণ। নারীর প্রতি সম্মানবোধ ব্যাপক অর্থবোধক। সাধারণ অর্থে এটি নারীকে সম্মান প্রদর্শনের অনুভূতি বা মনোভাবকে বুঝিয়ে থাকে। আর ব্যাপকার্থে নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো নারী জাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব। যেমন, সৃষ্টির বিচারে নর ও নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদান, নারী বলে কাউকে ছোট মনে না করা, নারী হিসেবে কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা। বরং যথাযথভাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা, তাদের কাজ করার সুযোগ প্রদান করা, তাদের মাল-সম্পদ, ইজ্জত, সম্মানের সংরক্ষণ করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের প্রকৃত উদাহরণ।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামে নারীদের প্রভূত সম্মান দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বজগৎ বিশেষ করে আরব সমাজ অজ্ঞতা ও বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সে সময় নারীদের কোনো মান-মর্যাদা ছিল না। তাদের কোনোরূপ অধিকার ছিল না। সেসময় নারীদের দ্রব্যসামগ্রী মনে করা হতো। তাদের ক্রীতদাসী হিসেবে বাজারে কেনাবেচা করা হতো। তারা ছিল ভোগ্যপণ্য, আনন্দদায়ক, প্রেমদায়িনী, সকল ভাঙনের উৎস, নরকের দরজা, অনিবার্য পাপ ইত্যাদি নামে খ্যাত। এমনকি কোনো সভ্যতায় তাদের বিষধর সাপের সাথে তুলনা করা হতো। অনেক সময় নারীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তৎকালীন আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অপমানজনক মনে করত ও কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দিত। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এ হীন কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে

যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৫৮)

ইসলাম নারীদের এহেন অপমানকর অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদের অধিকার ও মর্যাদার ঘোষণা দান করেছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীদের অবদান ও ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মানুষকে নারীর প্রতি সম্মানবোধের আদেশ করেছে। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান

সৃষ্টিগতভাবে ইসলামে নর-নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং মানুষ হিসেবে তারা উভয়ই সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা নর-নারী উভয়ের মাধ্যমেই মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এতে কারও একার কৃতিত্ব নেই। বরং উভয়েই সমান মর্যাদা ও কৃতিত্বের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

অর্থ : "হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও নারী থেকে।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

ধর্মীয় স্বাধীনতা, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছে। ধর্মীয় কর্তব্য পালন ও ফল লাভের ক্ষেত্রে নর-নারীতে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ইমান গ্রহণ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-ই সৎকর্ম করবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ ব্যাপারে কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ১২৪)

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও ইসলাম নারীদের মর্যাদা ও সম্মানের ঘোষণা প্রদান করেছে। মা হিসেবে নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছে। রাসুলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেছেন,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

অর্থ : "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" (মুসনাদে শিহাব আল-কাযায়ি)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, একদা জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা, ঐ সাহাবি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর কোন ব্যক্তি? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মাতা। এভাবে পরপর তিনবার এরূপ প্রশ্ন করলে রাসুল (স.) একই উত্তর দিলেন। চতুর্থবারে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমার পিতা। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের উপর পিতার চাইতেও মাতার অধিকার তিন গুণ বেশি। এটি মা হিসেবে নারীর অনন্য মর্যাদার পরিচায়ক।

কন্যা হিসেবেও নারীর মর্যাদা অপরিসীম। ইসলাম কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হারাম করেছে। তাদের ভালোভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে। স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান স্বামীর অনুরূপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

অর্থ : "নারীদের তেমনই ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থ : "তারা (নারীগণ) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ ।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৭)

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে। নারীগণ স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হিসেবেও তারা সম্পদ লাভ করবে। তাদের সম্পত্তিতে শুধু তাদেরই কর্তৃত্ব থাকবে। তারা তাদের ধন-সম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ, এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ ।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩২)

এভাবে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা ঘোষণা করেছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নারীদের এ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে।

নারীর প্রতি সম্মানবোধের উপায়

নারীর প্রতি সম্মানবোধ মানুষের উত্তম মন-মানসিকতার পরিচায়ক। শুধু অন্তর দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা দেখালেই চলবে না বরং নিজ কাজ-কর্ম ও আচার ব্যবহার দ্বারা এর প্রমাণ দিতে হবে। আমাদের পরিবারে ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যেমন মা, মেয়ে, বোন, স্ত্রী, দাদি, ফুফু, খালা রয়েছেন, তেমনি শিক্ষিকা, সহপাঠী ও নারী সহকর্মী রয়েছেন। এদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, যথাযথ শ্রদ্ধা-সম্মান ও মায়া-মমতা প্রদর্শন, জীবন ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রদান করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের নিদর্শন। আল-কুরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে আমাদের নানা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ

অর্থ : "তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে ।" (মুসলিম)। অর্থাৎ তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না, যথাযথভাবে তাদের হক আদায় করবে। বিদায় হজের ভাষণেও মহানবি (স.) নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

স্ত্রীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবনযাপন করবে ।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৯)

রাসুলুল্লাহ (স.) স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহারকারীদের উত্তম উম্মত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ -

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম ।" (তিরমিযি)

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী ঐ মুমিন ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও নিজ পরিবারের প্রতি অধিক সদয় ।" (তিরমিযি)

বস্তুত নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা মুমিনের নিদর্শন। নারীর প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে ইমান পূর্ণ হয় না।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) নারীদের শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান করতেন এবং স্ত্রী ও মেয়েদের ভালোবাসতেন। একদা তিনি সাহাবিগণকে নিয়ে বসা ছিলেন। এ সময় হযরত হালিমা (রা.) তাঁর নিকট আসলেন। হযরত হালিমা ছিলেন মহানবি (স.)-এর দুধমাতা। নবি করিম (স.) তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজ চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। এভাবে প্রিয়নবি (স.) তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখালেন।

কন্যা সন্তান প্রসঙ্গে নবি করিম (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তির কোনো কন্যা সন্তান থাকে আর সে তাকে জীবন্ত কবর দেয় না, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না, অন্য সন্তান অর্থাৎ ছেলে সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয় না, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, "একদা জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের উপর স্ত্রীদের কী অধিকার রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, তুমি যা খাবে তাদেরও তা-ই খাওয়াবে, যা পরিধান করবে তাদেরও তা-ই পরিধান করাবে, তাদের মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, তাদের গালিগালাজ করবে না, আর গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তাদের বিচ্ছিন্ন রেখো না।" (আবু দাউদ)

নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম। পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের জন্য এ গুণ থাকা আবশ্যক। অন্তর থেকে নারীদের সম্মান করতে হবে, মায়া-মমতা-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং স্ত্রী ও মেয়েদের ভালোবাসতে হবে। পাশাপাশি নিজ আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারাও এর প্রমাণ দিতে হবে। নারীদের কোনোরূপ অত্যাচার করা যাবে না, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না, ইভটিজিং করা যাবে না, তারা মনে কষ্ট পায় বা তাদের সম্মানহানি হয় এরূপ কোনো কাজ করা যাবে না। বরং সদাসর্বদা তাদের প্রাপ্য ও অধিকার আদায় করতে হবে। প্রয়োজনমতো তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। এভাবে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়। এতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারব।

কাজ :	শিক্ষার্থী নারীর প্রতি সম্মানবোধ বিষয়ে ১৫টি বাক্য সম্বলিত একটি পোস্টার বাড়িতে তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ১০

স্বদেশপ্রেম

স্বদেশ হলো নিজ দেশ বা নিজ মাতৃভূমি। যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যে স্থানের আলো-বাতাসে প্রতিপালিত হয় এবং বড় হয়ে উঠে সে স্থানকেই তার স্বদেশ বলা হয়। স্বদেশ হলো কারও জন্মভূমি বা মাতৃভূমি।

স্বদেশের প্রতি মায়া-মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম। নিজ দেশ ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত স্বভাব। কেননা মানুষ স্বদেশে জন্ম নেয়, সেখানের আলো-বাতাস গ্রহণ করে, সেখানের ফল-ফসল, খাদ্য-পানীয় দ্বারা তার দেহের পুষ্টি হয়। সেখানকার পরিবেশ, পাহাড়, পর্বত, সাগর-নদী, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য দেখে সে বড় হয়। মানুষের প্রতি স্বদেশ বা মাতৃভূমির অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং স্বভাবগতভাবেই স্বদেশের প্রতি এক ধরনের মায়া-মমতা, ভালোবাসা জন্ম নেয়। এ আকর্ষণ মানুষের অন্তর থেকে উৎসারিত। আজীবন মানুষ এ আকর্ষণ ও ভালোবাসা অনুভব করে। কোনো কারণে দেশ ছেড়ে বাইরে গেলেও দেশপ্রেমের এ অনুভূতি হ্রাস পায় না। বরং স্বদেশের প্রতি

ভালোবাসা, শ্রদ্ধা সর্বক্ষণই মানবমনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। স্বদেশ ও জন্মভূমির প্রতি এ আকর্ষণই স্বদেশপ্রেম।

গুরুত্ব

স্বদেশপ্রেম একটি মহৎ মানবিক গুণ। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ। বলা হয়েছে, حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ

অর্থ: "স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।"

প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি নিজ জন্মভূমিকে ভালোবাসেন। দেশের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করেন। অপরদিকে যারা দেশকে ভালোবাসে না, তারা চরম অকৃতজ্ঞ। তারা দেশদ্রোহী ও জঘন্য চরিত্রের অধিকারী। আর এরূপ ব্যক্তিরা কখনো প্রকৃত ধার্মিক ও মুমিন হতে পারে না।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। কাফিরদের অত্যাচারে তিনি প্রিয় জন্মভূমি মক্কা নগরী ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মক্কা ত্যাগকালে তিনি বারবার অশ্রুসজল নয়নে মক্কার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, "হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার নিজ গোত্রের লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"

দেশপ্রেম ও দেশের সেবা করা ইবাদত স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা পরকালে দেশরক্ষীদের বিরাট কল্যাণ দান করবেন। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "দেশরক্ষার জন্য সীমান্ত পাহারায় আল্লাহর রাস্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করা দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।" (তিরমিযি)

স্বদেশপ্রেমের উপায়

স্বদেশপ্রেম বা দেশের প্রতি ভালোবাসা অনুভূতির বিষয়। এটি প্রকাশ্যে দেখা যায় না। নিজের কাজ ও সেবার দ্বারা এ ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়। দেশের স্বার্থে কাজ করার দ্বারা দেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করা, জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা, দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে কাউকে সাহায্য না করা, দেশের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, দেশের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করা ইত্যাদি দ্বারা দেশকে ভালোবাসা যায়। দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করা দেশপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

দেশের মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের জন্য কাজ করাও স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক। দেশের কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির উন্নতিতে অবদান রাখার দ্বারাও দেশপ্রেমের নিদর্শন প্রকাশ করা যায়।

আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসব। নিজেকে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানে-গুণে সুন্দর ও যোগ্য করে তুলব। অতঃপর দেশের উন্নতির জন্য একযোগে কাজ করব। দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ হতে দেব না। দেশের সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করব। অপচয়, অপব্যয় ও বিনষ্ট করব না। দেশের প্রয়োজনে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করব না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ইসলামের আলোকে স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

কর্তব্যপরায়ণতা

আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম হলো কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষের সার্বিক উন্নতি ও সফলতার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। কর্তব্যপরায়ণতা হলো যথাযথভাবে কর্তব্য আদায় করা, দায়িত্বসমূহ পালন করা ইত্যাদি।

মানুষ হিসেবে আমাদের উপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারুভাবে এগুলো পালন করা এবং এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেকে যা করে তদনুসারে তার স্থান রয়েছে এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৩২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

অর্থ : "যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে– আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না– যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে।" (সূরা আল-কাহ্ফ, আয়াত ৩০)

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৬৪)

অন্য আয়াতে রয়েছে, "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়– এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৬)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এসেছে,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

অর্থ : "আল্লাহ কারও উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৬)

কর্তব্যপরায়ণতার নানা দিক

কর্তব্যপরায়ণতা মানবজীবনে সফলতা লাভের প্রধানতম হাতিয়ার। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য। আমরা সবাই পরিবারের মধ্যে বসবাস করি। সুতরাং পরিবারের সদস্য যথা মাতা-পিতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সকলের প্রতি আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতিও আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। শিক্ষার্থী হিসেবে বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীর প্রতি আমাদের নানা কর্তব্য রয়েছে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আসলেও আমাদের পালন করতে হয়। এসব কর্তব্য সঠিক সময়ে যথাযথভাবে পালন করা উচিত। এগুলোর প্রতি সচেতন থাকা ও এগুলো সম্পাদনে সচেষ্ট হওয়াই কর্তব্যপরায়ণতা।

গুরুত্ব

মানবজীবনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব অপরিসীম। যে ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ সকলেই তাঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান

করে। তিনি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেন। কর্তব্যপরায়ণতা মানুষকে সফলতা দান করে। ছাত্রজীবনে শিক্ষার্থীর কর্তব্য হলো শিক্ষকদের সম্মান করা, তাঁদের কথা মেনে চলা, ঠিকমতো লেখাপড়া করা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। যে শিক্ষার্থী এসব কর্তব্য ভালোভাবে পালন করে সে সবার ভালোবাসা লাভ করে। শিক্ষকগণ তাকে পছন্দ করেন। সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। ভবিষ্যৎ জীবনেও সে সফলতা লাভ করে। অন্যদিকে যে শিক্ষার্থী কর্তব্যপরায়ণ নয়, তাকে কেউ পছন্দ করে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়।

কর্তব্যপরায়ণতা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি তাঁর সকল কর্তব্য সম্পাদন করেন। আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করার পাশাপাশি তিনি বাস্তবজীবনের সব দায়িত্ব কর্তব্যও পালন করেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "তারা কর্তব্য পালন করে এবং সে দিনের ভয় করে যে দিনের অনিষ্ট হবে ব্যাপক।" (সূরা আদ-দাহর, আয়াত ৭)

কর্তব্য কাজে অবহেলা করলে পরকালে সে জন্য জবাবদিহি করতে হবে। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

অর্থ : "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারি)

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে আমাদের পরীক্ষা করার জন্য নানা দায়িত্ব কর্তব্য দিয়েছেন। পরকালে তিনি আমাদের সকলকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। সেদিন কর্তব্যপরায়ণগণ সহজেই মুক্তি লাভ করবে। তাদের জন্য রয়েছে সফলতা ও জান্নাত। অন্যদিকে যারা দুনিয়াতে কর্তব্যকাজে অবহেলা করেছে, ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেনি তারা বিপদগ্রস্ত হবে। তারা শাস্তি ভোগ করবে। তাদের জন্য রয়েছে চিরশাস্তির জাহান্নাম।

আমরা কর্তব্যপরায়ণ হতে সচেষ্ট হব। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করব। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করব।

পাঠ ১২

পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার, সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে পরিচ্ছন্নতা বলে। শরীর, মন ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সুন্দর ও পবিত্র রাখা, ময়লা-আবর্জনা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত রাখাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। দুর্নীতিমুক্ত, ভেজালমুক্ত ও ঝামেলামুক্ত অবস্থাও পরিচ্ছন্নতার অন্যতম রূপ। পরিচ্ছন্নতার আরবি প্রতিশব্দ হলো নাজাফাত (اَلنَّظَافَةُ)। ইসলামি শরিয়তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্থে সাধারণত তাহারাত শব্দটিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলামি পরিভাষায় শরিয়ত নির্দেশিত পদ্ধতিতে দেহ, মন, পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান ও পরিবেশ পরিষ্কার ও নির্মল রাখাকে তাহারাত বলা হয়।

গুরুত্ব

মানবজীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিচ্ছন্ন থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। নোংরা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকা ইমানদারগণের স্বভাব নয়। বরং মুমিনগণ সদা সর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র থাকেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ অর্থ : "পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক।" (মুসলিম)

প্রকৃত ইমানদার হওয়ার জন্য পবিত্র থাকা অপরিহার্য। কেননা পবিত্রতা ব্যতীত কোনো ইবাদত কবুল হয় না। সালাত আদায়ের জন্য মানুষের শরীর, পোশাক ও সালাতের স্থান পরিষ্কার ও পবিত্র হতে হয়। এগুলো নাপাক থাকলে সালাত শুদ্ধ হয় না। তেমনি আল-কুরআন তিলাওয়াতের জন্যও পাক-পবিত্র হতে হয়। অপবিত্র অবস্থায় আল-কুরআন স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ○ অর্থ : "আর এটা (আল-কুরআন) পবিত্রগণ ব্যতীত আর কেউ স্পর্শ করবে না।" (সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত ৭৯)

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সবাই ভালোবাসে। আল্লাহ তায়ালাও তাদের ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ○

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২২)

ইসলামি শরিয়তে পরিষ্কার-পবিত্র থাকার জন্য ওযু, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান প্রদান করা হয়েছে। দৈনিক পাঁচবার সালাতের পূর্বে ওযু করার দ্বারা মানুষের সকল অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা দূরীভূত হয়।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা হলো হাত, পা, মুখ, দাঁত ও গোটা শরীর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা। কারও হাত, পা, মুখ, দাঁত, তথা গোটা শরীর অপরিষ্কার ও ময়লাযুক্ত থাকলে তা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। এসব ময়লা, দুর্গন্ধ থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। কেননা অপরিচ্ছন্ন মানুষকে সকলে ঘৃণা করে। গোসল করার দ্বারা আমরা নিজেদের শরীর পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি। শরীরের ময়লা ও দুর্গন্ধ দূর করতে পারি।

রাতের বেলা ঘুমানোর পর সকালে আমাদের মুখমণ্ডল পরিচ্ছন্ন, সতেজ ও নির্মল থাকে না। চোখে পিঁচুটি লেগে থাকে, দাঁত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। খাদ্য গ্রহণ করলেও আমাদের দাঁতে ময়লা লাগে। সুতরাং দাঁত মুখ সদা-সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) দাঁত পরিষ্কারের জন্য মিসওয়াক করতেন। আমাদেরও তিনি মিসওয়াক করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার উম্মতের কষ্টের আশঙ্কা না করলে আমি তাদের প্রত্যেক সালাতের আগে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।" (বুখারি)

আমাদের অনেকে চুল ও নখ বড় রাখে। এতে দেখতে খারাপ লাগে। নখ বড় হলে এতে ময়লা জমে। অতএব, নখ কেটে ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে। চুল পরিপাটি করে রাখতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান। মহানবি (স.) একবার এলোমেলো চুলের এক লোককে দেখে বললেন, এ ব্যক্তি কি চুল ঠিক করার কিছু পেল না?

প্রস্রাব-পায়খানা করে ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়াও ইসলামের বিধান। এজন্য প্রথমে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে। এখন সহজলভ্য টিস্যু ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। অতঃপর পানি ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে। মহানবি (স.) বলেছেন, "নিশ্চয় প্রস্রাবই বেশির ভাগ কবর আযাবের কারণ হয়ে থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ)

অপর একটি হাদিসে এসেছে, "তোমরা প্রস্রাবের ছিটা-ফোঁটা থেকে বেঁচে থাক। কারণ কবরের বেশিরভাগ আযাব প্রস্রাবের ছিটা-ফোঁটা থেকে বেঁচে না থাকার কারণে হবে।" (দারাকুতনি)

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব সীমাহীন। সুতরাং আমরা প্রতিদিন গোসল করব। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে ভালোভাবে ওযু করব। আমাদের হাত, পা, নখ, চুল, দাঁত, চোখ সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

পোশাকের পরিচ্ছন্নতা

দৈহিক পরিচ্ছন্নতার মতো পোশাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার থাকলে দেহ মন ভালো থাকে, কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ○ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থ : "আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন।" (সূরা আল মুদ্দাস্‌সির, আয়াত ৪)

আমাদের প্রিয়নবি (স.) সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতেন। কাপড়-চোপড় অল্প মূল্যের হতে পারে, ছেঁড়া ফাটা হতে পারে, কিন্তু তা পরিষ্কার হওয়া উচিত। এজন্য সবসময় কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।

পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা

আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, হাট-বাজার, স্কুল-মাদ্রাসা, দোকানপাট, রাস্তাঘাট এসবই আমাদের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের কর্তব্য। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকলে নির্মল জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়।

যেখানে সেখানে কফ-থুথু, মলমূত্র ফেললে পরিবেশ নোংরা হয়। বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট, ময়লা-আবর্জনা, রাসায়নিক বর্জ্য ডাস্টবিনে না ফেলে রাস্তাঘাটে ফেলা উচিত নয়। এতে রাস্তাঘাট ময়লা হয়। নোংরা-আবর্জনা আমাদের শরীরে ও পোশাকে লাগে। নানা রকম রোগজীবাণু জন্মে। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

পানি ও বায়ু পরিবেশের অন্যতম উপাদান। এ দুটো মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পানি পান করি, পানিতে গোসল করি, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করি। সুতরাং পানি ও বায়ু সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। পানিতে ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না। অনেকে পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করে। এটা ঠিক নয়। আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় মলত্যাগ করব। ফলে আমাদের বায়ুও দুর্গন্ধযুক্ত হবে না।

পরিবেশ আমাদের। এ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। সুতরাং আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক হব। আমাদের ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখব। সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাব। যানবাহন, বাসস্টেশন, ফেরিঘাট, খেলার মাঠ, হাট-বাজারও পরিষ্কার রাখা দরকার। আমরা এ ব্যাপারেও সচেষ্ট হব। এলাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সাহায্য করব।

কাজ :	শিক্ষার্থীরা শরীর, পোশাক ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ৫টি করে মোট ১৫টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৩

মিতব্যয়িতা

মিতব্যয়িতা আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম দিক। মিতব্যয়িতা হলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা, পরিমিতিবোধ, কথা-বার্তা, কাজ-কর্মে যথার্থতা, মাল-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি। সাধারণত ধন-সম্পদের যথাযথ ও প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারকে মিতব্যয়িতা বলা হয়। অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খরচ করা, কম বা বেশি না করা।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি আমাদের বহু নিয়ামত দান করেছেন। এ সমস্ত নিয়ামত ও ধন-সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। এক্ষেত্রে অপব্যয়-অপচয় বা কৃপণতা করা যাবে না। বরং যখন যা প্রয়োজন সেরূপ ব্যয় করার মধ্যেই সফলতা রয়েছে। প্রয়োজনমাফিক সম্পদের এই ব্যবহারই মিতব্যয়িতা; এটি অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি পন্থা।

মিতব্যয়িতার গুরুত্ব

মিতব্যয়িতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণ। এটি মানবসমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। পক্ষান্তরে কৃপণতা ও অপচয় সমাজে নানা অশান্তির সৃষ্টি করে। অপচয়কারীর সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সে নানা অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। অন্যদিকে কৃপণতা মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য ও শত্রুতার জন্ম দেয়। সমাজে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। মিতব্যয়িতা মানুষকে অপচয় ও কৃপণতার কুফল থেকে রক্ষা করে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ فِي مَعِيْشَتِهِ অর্থ : "ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।" (মুসনাদে আহমাদ)

মিতব্যয়ী ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করেন। ফলে তিনি বহু সাওয়াবের অধিকারী হন। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৎকাজে খরচ কর, তবে তোমার কল্যাণ হবে। আর যদি তা আটকে রাখ তবে তোমার অকল্যাণ হবে। তবে তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তোমাকে তিরস্কার করা হবে না।" (তিরমিযি)

মিতব্যয়িতা মুমিনের গুণ। প্রকৃত ইমানদারগণ শুধু নিজ প্রয়োজনমাফিক খরচ করেন। তারা কৃপণতাও করেন না। আবার অপচয়ও করেন না। তাঁরা মিতব্যয়ী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেন। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○

অর্থ : "আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।" (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৬৭)

আল্লাহ্ আরও বলেন, "তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২৯)

আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন মিতব্যয়িতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর ও পরিবারের জন্য প্রয়োজনমাফিক খরচ করতেন। এতে তিনি যেমন আরাম আয়েশ ও বিলাসিতা করতেন না তেমনি কৃপণতাও করতেন না। অতিরিক্ত সম্পদ তিনি দান করে দিতেন। সাহাবিগণ, ওলিগণের জীবনী থেকেও আমরা এ শিক্ষা লাভ করি। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে ইসলামের দিকে হিদায়াত করা হয়েছে, তার প্রয়োজনমাফিক জীবনোপকরণ আছে এবং সে এতে তুষ্ট রয়েছে।" (তিরমিযি)

মিতব্যয়িতা মানুষকে নানা সৎগুণে ভূষিত করে। লোভ-লালসা, অপচয়-অপব্যয়, কৃপণতা, অলসতা, আরামপ্রিয়তা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। মিতব্যয়িতা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট পছন্দনীয়। আমরা সকলে জীবনযাপনে মিতব্যয়ী হব। সবধরনের অপচয়, কৃপণতা ও বিলাসিতা থেকে দূরে থাকব। তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর হবে।

কাজ : শিক্ষার্থী মিতব্যয়িতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের দুটি করে বাণী খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৪

আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো নিজের সংশোধন, নিজেকে খাঁটি করা, পরিশুদ্ধ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার স্মরণ, আনুগত্য ও ইবাদত ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাকেও আত্মশুদ্ধি বলা হয়।

আত্মশুদ্ধির আরবি পরিভাষা হলো 'তাযকিয়াতুন নাফস'। একে সংক্ষেপে 'তাযকিয়াহ'ও বলা হয়। স্বীয় আত্মাকে সবধরনের পাপ-পংকিলতা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রাখাই তাযকিয়াহ-এর উদ্দেশ্য।

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুত দেহ ও অন্তরের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। দেহ হলো মানুষের হাত-পা, মাথা, বুক ইত্যাদি নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। আর অন্তর হলো আত্মা বা কাল্ব। এ দুটোর মধ্যে কাল্বের ভূমিকাই প্রধান। মানুষের অন্তর যেরূপ নির্দেশনা প্রদান করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তদ্রূপই কাজ করে থাকে। সুতরাং মানুষের কাজকর্মের শুদ্ধতার জন্য প্রথমেই কাল্বের সংশোধন প্রয়োজন। আর কাল্বের সংশোধনই হলো আত্মশুদ্ধি। কাল্ব যদি সৎ ও ভালো কাজের নির্দেশ দেয় তবে দেহও ভালো কাজ করে। একটি হাদিসে মহানবি (স.) সুন্দরভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "জেনে রেখো! শরীরের মধ্যে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে। যদি তা সংশোধিত হয়ে যায়, তবে গোটা শরীরই সংশোধিত হয়। আর যদি তা কলুষিত হয়, তবে গোটা শরীরই কলুষিত হয়ে যায়। মনে রেখো তা হলো কাল্ব বা অন্তর।" (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র। তিনি পবিত্রতা ব্যতীত কোনো জিনিসই কবুল করেন না। সুতরাং ইবাদতের জন্যও দেহ-মন পবিত্র হওয়া আবশ্যক। দৈহিক পবিত্রতা লাভ করলেই হবে না বরং অন্তরকেও পবিত্র করতে হবে। অন্য সবকিছু থেকে মনকে পবিত্র রেখে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করতে হবে। আর অন্তর-আত্মার পবিত্রতা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

মানুষের আত্মিক প্রশান্তি, উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্যও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মশুদ্ধি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। সদা সর্বদা ভালো চিন্তা ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। আত্মশুদ্ধি মানুষের চরিত্রে প্রশংসনীয় গুণাবলি চর্চার সুযোগ করে দেয়। পক্ষান্তরে যার আত্মা কলুষিত সে নানাবিধ পাপ চিন্তা ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকে। সে অন্যায়-অত্যাচার, সন্ত্রাস-নির্যাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না। ফলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাও বিনষ্ট হয়। অতএব, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা ও বিকাশের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

আত্মশুদ্ধি মানুষকে বিকশিত করে, সফলতা দান করে। ইহজীবনে আত্মশুদ্ধি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে। এরূপ মানুষ সবধরনের কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে, সকল পাপাচার ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে সে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে।

বস্তুত আত্মশুদ্ধি হলো সফলতা লাভের মাধ্যম। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে ব্যর্থ সে দুর্ভাগা। সে কখনোই সফলতা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখবে সেই সফলকাম হবে, আর সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে।" (সূরা আশ্-শাম্স, আয়াত ৯-১০)

পরকালীন জীবনের সফলতা এবং মুক্তিও আত্মশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ আত্মাকে পবিত্র রাখবে পরকালে সেই মুক্তি লাভ করবে। তার জন্য পুরস্কার হবে জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

অর্থ : "সেদিন ধনসম্পদ কোনো কাজে আসবে না, আর না কাজে আসবে সন্তান-সন্ততি। বরং সেদিন সে ব্যক্তিই মুক্তি পাবে, যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে।" (সূরা আশ্-শুআরা, আয়াত ৮৮-৮৯)

মূলত ইহ ও পরকালীন সফলতা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। এজন্যই ইসলামে আত্মশুদ্ধির প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আত্মশুদ্ধির উপায়

মানুষের অন্তর হলো স্বচ্ছ কাঁচের মতো। যখনই মানুষ কোনো খারাপ কাজ করে তখনই তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। এভাবে বারংবার পাপ কাজ করার দ্বারা মানুষের অন্তর পুরোপুরি কলুষিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেছেন,

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

অর্থ : "কখনোই নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে।" (সূরা আল-মুতাফ্ফিফিন, আয়াত ১৪)

মানুষের কাজের কারণেই মানুষের অন্তর কলুষিত হয়। সুতরাং আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায় হলো খারাপ কাজ ত্যাগ করা এবং কুচিন্তা, কুঅভ্যাস বর্জন করা। সদাসর্বদা সৎকর্ম, সৎচিন্তা, নৈতিক ও মানবিক আদর্শে নিজ চরিত্র গড়ে তোলার দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

মহানবি (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক বস্তুরই পরিশোধক যন্ত্র রয়েছে। আর অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র হলো আল্লাহর যিকির।" (বায়হাকি)

বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের কালো দাগ ও মরিচা দূর করা যায়। যিকিরের মাধ্যমে আত্মা প্রশান্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। এ ছাড়াও তওবা, ইস্তিগফার, তাওয়াক্কুল, যুহ্দ, ইখলাস, সবর, শোকর, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ইত্যাদির মাধ্যমেও আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

আমরা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করব, আত্মশুদ্ধি অর্জন করব এবং মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হব।

কাজ :	শিক্ষার্থী আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ নিজের খাতায় বাড়ি থেকে লিখে আনবে এবং শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৫

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এর আরবি পরিভাষা হলো 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার'। ইসলামি জীবনদর্শনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য। সৎকাজের আদেশ বা 'আমর বিল মারূফ' বলতে সাধারণত কাউকে কোনোরূপ ন্যায় ও ভালো কাজের নির্দেশ দান করা বোঝায়। তবে ব্যাপকার্থে কোনো ব্যক্তিকে ইসলামসম্মত কাজের নির্দেশ দেওয়া, উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা, অনুরোধ করা, পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি সবই সৎকাজের আদেশের মধ্যে গণ্য। অসৎকাজে নিষেধ বা 'নাহি আনিল মুনকার' হলো যাবতীয় মন্দ, খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখা। যেসব কাজ ইসলাম সমর্থন করে না এবং যেসব কাজ নীতি-নৈতিকতা ও বুদ্ধি-বিবেকবিরোধী সেসব কাজ থেকে কাউকে নিষেধ করা, বিরত রাখা, নিরুৎসাহিত করা, বাধা দেওয়া ইত্যাদি 'নাহি আনিল মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। শুধু মৌখিক নিষেধের দ্বারা নয় বরং নানাভাবেই অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যায়। একটি হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোনো খারাপ কাজ হতে দেখে তবে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিরোধ করে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখের দ্বারা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাও না রাখে তবে সে যেন অন্তর দ্বারা এর প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। আর এটা হলো ইমানের দুর্বলতম স্তর।" (মুসলিম)

এ হাদিসে মহানবি (স.) হাত, মুখ ও অন্তর দ্বারা 'নাহি আনিল মুনকার' বা খারাপ কাজ প্রতিরোধ করার কথা বলেছেন। হাদিস বিশারদগণের মতে, হাত দ্বারা বলতে এখানে নিজ শক্তি ক্ষমতা ও প্রভাব দ্বারা প্রতিরোধ করার কথা বোঝায়। মুখ দ্বারা প্রতিরোধ হলো নিষেধ করা, নিরুৎসাহিত করা, জনমত গঠন করে প্রতিরোধ করা। আর অন্তর দ্বারা প্রতিরোধ হলো মনে মনে ঐ কাজকে ঘৃণা করা, ঐ কাজ বন্ধ হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা, প্রতিরোধের জন্য চিন্তা করা, পরিকল্পনা করা এবং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অন্তরে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকা ইত্যাদি। নানাভাবে মানুষকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করাই নাহি আনিল মুনকার।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। সমাজে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার জন্য সবসময়ই কিছুসংখ্যক লোক থাকতে হয়। অন্যথায় সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। সমাজে অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস, নির্যাতন ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়ে যায়। সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার জন্য এরূপ লোকদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করা অত্যন্ত মহৎ কাজ। এ মহৎ কাজ যারা সম্পাদন করবেন আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করবেন। পবিত্র কুরআনে সৎকাজের আদেশদানকারী এবং অসৎকাজের নিষেধকারীকে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

অর্থ : "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার মুমিনগণের বৈশিষ্ট্য। এ কাজ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

অর্থ : "আর তারা এমন লোক, আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর কর্মের প্রতিফলতো আল্লাহরই নিকট।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৪১)

সৎকাজের আদেশ সমাজে সৎ ও ন্যায় কার্যাবলির প্রসার ঘটায়। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সদাচরণ ও নৈতিক গুণাবলি বিকশিত হয়। আর অসৎ কাজের নিষেধ সমাজ থেকে অন্যায়, অশ্লীলতা ও নির্যাতনের মূলোৎপাটন করে। মানুষ এর মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বুঝতে শিখে ও ধীরে ধীরে সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে। অন্যদিকে সমাজে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ না থাকলে সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। একটি হাদিসে মহানবি (স.) একটি উপমার মাধ্যমে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমালংঘনকারীদের উদাহরণ হলো একদল লোকের ন্যায়, যারা জাহাজের যাত্রী। লটারির মাধ্যমে এদের একদল উপর তলায় ও অপর দল নিচতলায় স্থান পেল। নিচতলার লোকজন পানির প্রয়োজন হলে উপর তলার লোকদের নিকট পানি আনতে যায়। এমতাবস্থায় তারা (নিচতলার লোকজন) বলল, আমরা যদি নিচেই একটা ছিদ্র করে নেই তবে উপর তলার লোকদের কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচা যেত। এখন যদি তারা (উপর তলার লোকজন) তাদের বাধা দেয় তবে নিজেরাও বাঁচতে পারে এবং সবাইকে বাঁচাতে পারবে।" (বুখারি)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ মানুষকে ধ্বংস থেকে বিরত রাখে। এতে সমাজে দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে আরও গভীরভাবে সৎকাজে উৎসাহী হয়। নিজ জীবনে সে ব্যক্তি সকল অন্যায় ও অসুন্দর কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার ত্যাগের পরিণতি

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা আবশ্যকীয় কর্তব্য। এ কর্তব্যে অবহেলা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই এ জন্য শাস্তি প্রদান করেন। আর পরকালে এরূপ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদেরকে দাউদ (আ.) ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল ও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিল। তারা পরস্পরকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখত না। বস্তুত অত্যন্ত জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৭৮-৭৯)

মহানবি (স.) বলেছেন, "লোকেরা যখন কোনো অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখে, কিন্তু তারা তার হাত ধরে না (প্রতিরোধ করে না) এরূপ লোকদের উপর অচিরেই আল্লাহ শাস্তি পাঠাবেন।" (তিরমিযি)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। অন্যথায় অচিরেই আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন। তখন তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না।" (তিরমিযি)

প্রকৃতপক্ষে, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার মানব জীবনের অপরিহার্য কাজ। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা এর উপরই নির্ভরশীল। তবে অন্যকে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করে বসে থাকলে চলবে না। বরং নিজেও তদনুযায়ী আমল করতে হবে। কেননা নিজে আমল না করে অন্যকে আদেশ দিলে পরকালে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহানবি (স.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে

নিক্ষেপ করা হবে। এতে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসবে। সে এটা নিয়ে চারপাশে চক্কর দিতে থাকবে যেমনভাবে গাধা চক্রের মধ্যে ঘুরে থাকে। তখন জাহান্নামিরা তার চারপাশে সমবেত হবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি সৎকাজের আদেশ দিতে না এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে না? উত্তরে সে বলবে, হ্যাঁ আমি সৎকাজের আদেশ দিতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর অন্যদের খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকতাম না।" (বুখারি ও মুসলিম)

অতএব, আমরা নিজেরা সৎকাজ করব ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকব। অতঃপর নিজ পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, প্রতিবেশী, সকলকে সৎকাজে উৎসাহিত করব। সৎকাজে সাহায্য-সহযোগিতা করব। আর অসৎকাজ থেকে তাদের বিরত রাখতে চেষ্টা করব। আমাদের সমাজে প্রচলিত অন্যায়, অসত্য ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। সকলে মিলে সকল অন্যায় ও অত্যাচার দূর করে সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠনে সচেষ্ট হব।

কাজ : শিক্ষার্থী সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ সম্পর্কে ১৫টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৬

আখলাকে যামিমাহ

পরিচয়

আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় স্বভাব। মানুষের সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ভালো নয়। বরং মানব চরিত্রে এমন কিছু দিক রয়েছে যা অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। মানব চরিত্রের এসব নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়। আখলাকে যামিমাহ হলো আখলাকে হামিদাহ-র সম্পূর্ণ বিপরীত। আখলাকে যামিমাহ-র অপর নাম আখলাকে সায়্যিআহ। আখলাকে সায়্যিআহ অর্থ অসৎচরিত্র, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি।

মানব চরিত্রে বহু নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- মিথ্যা বলা, প্রতারণা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপব্যয়-কৃপণতা, ক্রোধ, গর্ব-অহংকার ইত্যাদি। এসব স্বভাব আখলাকে যামিমাহ-র অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা আখলাকে যামিমাহ এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব।

কুফল বা অপকারিতা

মানব সমাজে আখলাকে যামিমাহর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি যেমন ব্যক্তি জীবনে অশান্তি ডেকে আনে তেমনি সমাজ জীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অসৎচরিত্র বা চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম। তার মধ্যে নীতি, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না। সে শুধু গড়ন-আকৃতিতে মানুষ, কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র হয় পশুর ন্যায়। নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য সে মানবিক আদর্শসমূহকে বিসর্জন দেয়। আখলাকে যামিমাহ-র ফলে সে সবরকমের অন্যায়, অত্যাচার ও অশালীন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি হত্যা-রাহাজানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিতেও জড়িয়ে পড়ে। ফলে শান্তি, নিরাপত্তা, সামাজিক ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। সমাজে অরাজকতা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করে।

মন্দ চরিত্রের মানুষ সমাজে ঘৃণার পাত্র। কেউ তাকে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে, এড়িয়ে চলে। তার বিপদাপদেও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। অসৎচরিত্র মানুষকে পরকালীন জীবনে শোচনীয় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। চরিত্রহীন ব্যক্তি সকল প্রকার পাপাচারে লিপ্ত থাকে, সে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য

হয়। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ভালোবাসেন না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা এরূপ অসৎচরিত্র ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। মহানবি (স.) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ

অর্থ : "দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (আবু দাউদ)

বস্তুত আখলাকে যামিমাহ্ অত্যন্ত ঘৃণিত ও বর্জনীয় স্বভাব। এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকলেরই এসব স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

আমরা অসৎচরিত্র ত্যাগ করে সৎচরিত্র অবলম্বন করব। সত্যিকার মানুষ হিসেবে সকলের প্রিয়পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করব।

পাঠ ১৭

প্রতারণা

পরিচয়

প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। ইসলামি পরিভাষায়, প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়।

প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রতারণার দৃষ্টান্ত বেশি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ওজনে কম দেওয়া, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া, বেশি দামের দ্রব্যের সাথে কম দামের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, ফলে ও মাছে রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের মিথ্যা প্রচারণা চালানো ইত্যাদি।

এ ছাড়াও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতারণা হতে পারে। যেমন, পরীক্ষায় নকল করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে অন্যের হক নষ্ট করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভুল ও মিথ্যা তথ্য দেওয়া, পথচারীকে ভুল রাস্তা বলে দেওয়া, সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ, এমনকি নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করাও প্রতারণার শামিল।

প্রতারণা বর্জনের গুরুত্ব

প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়। কেননা ইমান ও প্রতারণা এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রে থাকতে পারে না। প্রকৃত মুমিন কখনোই প্রতারণার আশ্রয় নেন না। নিজ স্বার্থের বিরোধী হলেও মুমিন ব্যক্তি সততা ও সত্যবাদিতার উপর অটল থাকেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) বলেছেন, "যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমার উম্মত নয়। আর যে কারও সাথে প্রতারণা করে সে মুসলিম দলভুক্ত নয়।" (মুসলিম)। রাসুলুল্লাহ (স.) অন্য হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযি)

ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা জায়েজ নয়। কোনো কাজেই প্রতারণা করা যাবে না, সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ করা যাবে না এবং সত্য ও প্রকৃত অবস্থা গোপন করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : "তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ৪২)

ব্যবসায়-বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্য সঠিকভাবে লেনদেন করতে হবে। পণ্যের দোষ ত্রুটি ক্রেতার নিকট পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে হবে। পণ্যের সঠিক অবস্থা না জানিয়ে লেনদেন করা প্রতারণা, এটা হারাম বা অবৈধ। একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, "একদা রাসুলুল্লাহ (স.) একটি খাদ্যদ্রব্যের স্তূপের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় তিনি স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, স্তূপের ভিতরের দ্রব্য ভিজা ও বাইরেরগুলো শুকনো। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কী? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! বৃষ্টির দরুন এগুলো ভিজে গেছে। অতঃপর রাসুল (স.) বললেন, তবে তুমি ভিজা খাদ্যশস্য কেন উপরে রাখলে না? তাহলে ক্রেতারা এর প্রকৃত অবস্থা জানতে পারত (ফলে প্রতারিত হতো না।)। বস্তুত যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।" (মুসলিম)

প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এরদ্বারা পরস্পরের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতা জন্ম নেয়। প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে যেমন মানবসমাজে ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহানবি (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।" (ইবনে মাজাহ)

প্রকৃতপক্ষে, প্রতারণাকারী দুনিয়াতেও ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। আর আখিরাতে তার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ও ধ্বংস। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

অর্থ : "ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তারা মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।" (সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফিন, আয়াত ১-৩)

প্রতারণা আখলাকে যামিমাহ-র অন্যতম। এটি মারাত্মক অপরাধ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। অতএব, আমাদেরকে সকল কথা ও কাজে প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতারণা বর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৮

গিবত

পরিচয়

গিবত আরবি শব্দ। এর অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে

মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। প্রচলিত অর্থে অসাক্ষাতে কারও দোষ বলাকে গিবত বলা হয়।

একটি হাদিসে মহানবি (স.) সুন্দরভাবে গিবতের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। একদা নবি (স.) বললেন, তোমরা কি জানো গিবত কী? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, "গিবত হলো- তুমি তোমার ভাইয়ের এমনভাবে আলোচনা করবে যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলা হলো, আমি যা বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গিবত হবে? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তা গিবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে তা হবে অপবাদ।" (মুসলিম)

গিবতের স্বরূপ

আমরা অনেক সময় অলস বসে থাকি। হাতে কোনো কাজ থাকে না। বন্ধুবান্ধব মিলে গল্প করি। এসময় কথায় কথায় অন্যের সমালোচনা করি। সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের দোষ খুঁজে বেড়াই। তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি। বস্তুত এসবই গিবত। ঠাট্টাচ্ছলে গল্প করার সময় এসব কথার দ্বারা অনেক বড় গুনাহ হয়। তবে শুধু কথার মাধ্যমেই নয় বরং আরও নানা ভাবে গিবত হতে পারে। যেমন, লেখনীর মাধ্যমে, ইশারা-ইঙ্গিতে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কারও সমালোচনা করা। কারও কোনো অভ্যাস নিয়ে চিত্র, লেখা বা কার্টুনের মাধ্যমেও গিবত করা যায়।

কারও কোনো দোষ আলোচনা করা গিবতের সবচেয়ে পরিচিত রূপ। এ ছাড়াও শারীরিক দোষ-ত্রুটি, পোশাক-পরিচ্ছদের সমালোচনা, জাত-বংশ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, কারও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস নিয়ে সমালোচনা করা ইত্যাদি গিবতের অন্তর্ভুক্ত।

গিবতের কুফল ও পরিণাম

ইসলামি শরিয়তে গিবত বা পরনিন্দা করা অবৈধ। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ

অর্থ : "আর তোমরা একে অন্যের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে ভালোবাসবে? বস্তুত তোমরা নিজেরাই তা অপছন্দ করে থাকো।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২)

গিবত করাকে আল-কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং গিবত খুবই অপছন্দনীয় কাজ। সুস্থ বিবেকবান কোনো মানুষই এরূপ কাজ পছন্দ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালাও গিবত করা পছন্দ করেন না।

পবিত্র হাদিসে মহানবি (স.) আমাদের গিবতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! গিবত কীভাবে ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক অপরাধ হয়? রাসুল (স.) বললেন, কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গিবতকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করবেন না, যতক্ষণ না যার গিবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি মাফ করবে।" (বায়হাকি)

ইসলামি শরিয়তে গিবত সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারও গিবত করা যেমন হারাম তেমনি গিবত শোনাও হারাম। গিবত না করার পাশাপাশি গিবত শোনা থেকেও বিরত থাকতে হবে। গিবতকারীকে গিবত বলা থেকে বিরত থাকার জন্য বলতে হবে। নতুবা যেসব স্থানে গিবতের আলোচনা হবে সেসব স্থান এড়িয়ে চলতে হবে।

গিবতের পাপ অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা অনেক সময় এমন ব্যক্তির গিবত করে থাকি যার নিকট ক্ষমা চাওয়ারও সুযোগ নেই। ফলে গিবতের এ পাপ আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। সুতরাং আমরা গিবত করা থেকে বিরত থাকব। যদি কোনো কারণে তা হয়ে যায় তবে সাথে সাথে গিবতকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব।

কাজ : শিক্ষার্থী গিবতের পরিচয়, কুফল ও পরিণাম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বাড়ি থেকে লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৯

হিংসা

হিংসা আখলাকে যামিমাহ্-র অন্যতম দিক। হিংসা-বিদ্বেষ মানে অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা, নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে ঘৃণা করা, শত্রুতাবশত অন্যের ক্ষতি কামনা করা, অন্যের উন্নতি, সুখ সহ্য করতে না পারা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় অন্যের সুখ-সম্পদ, শান্তি-সাফল্য ধ্বংস হওয়া ও নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলা হয়। আরবি ভাষায় হিংসার প্রতিশব্দ হলো হাসাদ (اَلْحَسَدُ)।

হিংসার কুফল

হিংসা-বিদ্বেষ মানব চরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস। এটি মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি কখনোই সৎচরিত্রবান হতে পারে না। কেননা গর্ব-অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি হিংসার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হিংসুক ব্যক্তির মধ্যে এসব অভ্যাসও গড়ে ওঠে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সকলের সাথে সে মিলেমিশে চলে। সামাজিক শান্তিই তার প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক শান্তির জন্য প্রয়োজন সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, "পরস্পর কল্যাণকামিতাই হলো দীন। হিংসা এসব সৎগুণ ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে, নিজের স্বার্থকে সবচেয়ে বড় করে দেখে। সে অন্যকে ঘৃণা করে, অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, অন্যের অনিষ্ট কামনা করে। এতে মানবসমাজে ঐক্য, সংহতি বিনষ্ট হয়, শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়।"

হিংসা-বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির পথে অন্তরায়। এর ফলে জাতির মধ্যে বিভেদ বৈষম্য দেখা দেয়, শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। এতে মুসলিম জাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুণ্ডনকারী (ধ্বংসকারী) রোগ– ঘৃণা ও হিংসা তোমাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি চুল মুণ্ডনের কথা বলছি না, বরং তা হলো দীনের মুণ্ডনকারী।" (তিরমিযি)

হিংসা বিদ্বেষ পরকালীন জীবনেও মানুষের ক্ষতির কারণ। হিংসা মানুষের সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। মহানবি (স.) বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ : "তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়), হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়)।" (আবু দাউদ)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির গুনাহ্ মাফ হয় না। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী।" (আদাবুল মুফরাদ)

হিংসার ব্যাপারে ইসলামের বিধান

ইসলামি শরিয়তে হিংসা বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কখনোই হিংসুক হতে পারে না। বরং অন্যের কল্যাণ কামনা ও পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা হিংসা থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

অর্থ : "আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে (পানাহ্ চাই) যখন সে হিংসা করে।" (সূরা আল-ফালাক, আয়াত ৫)

মহানবি (স.) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর হিংসা করবে না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে না ও পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। বরং সবাই আল্লাহর বান্দা, ভাই-ভাই হয়ে থাকবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

হিংসা-বিদ্বেষ অত্যন্ত মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। এটি মানুষের নেক আমল ও সৎচরিত্রসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। ব্যক্তিগত সাফল্য ও জাতীয় উন্নতির জন্য সকলেরই হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা উচিত।

> **কাজ :** শিক্ষার্থী হিংসার কুফল সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর একটি বাণী লিখে পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ২০

ফিতনা-ফাসাদ

পরিচয়

ফিতনা ও ফাসাদ উভয়টি আরবি শব্দ। ফিতনা (اَلْفِتْنَةُ) অর্থ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, কলহ ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি বুঝায়। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত অরাজক পরিস্থিতিই ফিতনা-ফাসাদ। মানবসমাজে ভয়-ভীতি, অত্যাচার-অনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করা যায়। এরূপ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিই ফিতনা-ফাসাদ। সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, খুন, অপহরণ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ফিতনা-ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, কলহ, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিও ফিতনা-ফাসাদের অন্যরূপ।

কুফল

ইসলাম শান্তির ধর্ম, সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবন ব্যবস্থা। এতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কোনো স্থান নেই। বরং ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি ইসলামের মূল ভিত্তি। ইসলামের সকল আচার-আচরণ, বিধি-বিধান বিজ্ঞানসম্মত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। জামাআতে সালাত আদায় এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, সাদা-কালো সবাই সারিবদ্ধভাবে এক ইমামের নেতৃত্বে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। সকলে একই সাথে রুকু-সিজদাহ করে, সালাত আদায় করে। এতে শৃঙ্খলাহীনতার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ্ তায়ালার অন্যান্য বিধি-বিধানও তদ্রূপ। এমনকি এ গোটা মহাবিশ্বও আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত সুশৃঙ্খল পন্থায় পরিচালিত। কোথাও কোনোরূপ অরাজকতা ও অব্যবস্থাপনা নেই।

আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনও এরূপ শৃঙ্খলাপূর্ণ হওয়া উচিত। এটাই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু ফিতনা-ফাসাদ এ লক্ষ্য পূরণের প্রধান অন্তরায়। ফিতনা-ফাসাদের ফলে জীবনের সর্বস্তরেই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে না। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। ফিতনা-ফাসাদ সমাজে ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের জন্ম দেয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে। এককথায়, ফিতনা-ফাসাদের ফলে সমাজে ও দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। শান্তি ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

বস্তুত ফিতনা-ফাসাদ অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে সকল অন্যায়-অত্যাচারের দরজা খুলে যায়। অরাজক পরিস্থিতিতে অসৎ মানুষেরা সব ধরনের পাপ কাজের সুযোগ পায়। এজন্যই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

অর্থ : "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯১)

ফিতনা-ফাসাদ সমাজে অনৈতিকতার জন্ম দেয়, নিন্দনীয় চরিত্র চর্চার প্রসার ঘটায়। ফিতনা-ফাসাদ সমাজের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে।

ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে ইসলামি বিধান

ফিতনা-ফাসাদ সম্পূর্ণরূপে ইসলামি আদর্শের বিরোধী। এটি হারাম বা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তায়ালা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

অর্থ : "পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ৫৬)

পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ তার অন্যায় ও মন্দকর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে নানা ধরনের ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। যারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে তারা খুবই জঘন্য চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ঘৃণা করেন। তিনি বলেন,

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ○

অর্থ : "তুমি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করতে চাইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৭৭)

মানবজীবনে ফিতনা-ফাসাদের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা সদাসর্বদা এ থেকে বেঁচে থাকব। উত্তম গুণাবলির অনুসরণ ও সৎকর্মের মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করব। যেকোনো প্রকার সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অরাজকতার বিরুদ্ধে সকলে মিলে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

কাজ : শিক্ষার্থী ফিতনা-ফাসাদের কুফলগুলো লিখে একটি তালিকা তৈরি করে বাড়ির বৈঠকখানায় ঝুলিয়ে রাখবে।

পাঠ ২১

কর্মবিমুখতা

কর্মবিমুখতা বলতে কাজ না করার ইচ্ছাকে বোঝায়। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলা হয়। কোনো অক্ষম ব্যক্তি যদি কোনো কাজ করতে না পারে তবে তা কর্মবিমুখতা নয়। যেমন- অন্ধ, বধির বা প্রতিবন্ধীরা শারীরিক কারণে সবধরনের কাজ করতে সমর্থ নয়। বরং যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলসতা বা অন্যকোনো কারণে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ না করে বেকার বসে থাকা হলো কর্মবিমুখতা।

কুফল

মানবজীবনে কাজের কোনো বিকল্প নেই। জীবনে বড় হওয়ার জন্য, জীবিকা উপার্জনের জন্য মানুষকে বহু কাজ করতে হয়। সময়মতো যথাযথভাবে এসব কাজ সম্পাদনের উপরই মানুষের উন্নতি ও সফলতা নির্ভর করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বা জাতি কর্মবিমুখ সে ব্যক্তি বা জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। কর্মবিমুখতা একটি জাতির জন্য দুর্ভাগ্য, কলঙ্ক স্বরূপ।

কর্মবিমুখতা মানুষের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে। এতে মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মানুষের কর্মস্পৃহা, কর্মক্ষমতা লোপ পায়। বলা হয় 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। অলস ব্যক্তিরা নানা অসৎ ও অনৈতিক চিন্তা ও কর্মে ব্যাপৃত থাকে। অনেক সময় সন্ত্রাস সৃষ্টি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি অসৎ ও পাপকার্যে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেয়।

কর্মবিমুখতার ফলে মানুষের মেধা, শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়। কর্মবিমুখ বেকারকে কেউ ভালোবাসে না। কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে চায় না। কর্মবিমুখতা মানুষের আত্মসম্মানবোধ লোপ করে। অন্যের অর্থে জীবনযাপন করার মানসিকতা তৈরি হয়। এতে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

কর্মবিমুখতা পরিহারের গুরুত্ব

ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। মানুষের অকল্যাণ হয় এমন কোনো বিধান বা আচার-আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। কর্মবিমুখতা মানবজীবনে অভিশাপ স্বরূপ। ইসলামে এর কোনো স্থান নেই। ইসলামে মানুষকে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইবাদত পালনের পরপরই কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

অর্থ : "অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর।" (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ১০)

হাদিসে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজকেও ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবি (স.) বলেছেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

অর্থ : "হালাল উপায়ে জীবিকা অন্বেষণ করা ফরজের পর আরও একটি ফরজ কাজ"। (বায়হাকি)

জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এজন্য বসে থাকলে চলবে না। বরং নিজ উদ্যোগে কাজ করার

জন্য ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কোনোদিন খায়নি।" (বুখারি)

ইসলামে কর্মবিমুখতার কোনো সুযোগ নেই। বরং জীবিকা অর্জনের জন্য যেকোনো হালাল শ্রমকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। নবি-রাসুলগণের জীবনী পড়লে জানা যায় যে, তাঁরা জীবিকা উপার্জনের জন্য নানা কাজ করেছেন। হযরত আদম (আ.) কৃষি কাজ করতেন, হযরত দাউদ (আ.) কামারের কাজ করতেন, আমাদের নবি (স.) ব্যবসা করতেন। জীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা ছাগলও চরিয়েছেন। সুতরাং কোনো শ্রমই ছোট নয়। হযরত উমর (রা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহিত হয়ে বসে না থাকে। আমাদের অনেকে পড়ালেখা শেষ করে বেকার বসে থাকে। এরূপ বেকারত্ব ঠিক নয়। বরং যার যার সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করা দরকার। এতে শরীর মন ভালো থাকে। আল্লাহ তায়ালাও সন্তুষ্ট হন।

পাঠ ২২

সুদ ও ঘুষ

পরিচয় : সুদ

সুদ ফার্সি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা(اَلرِّبٰوا)। কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (اَلرِّبٰوا) বা সুদ বলা হয়। মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবকালে এটি একধরনের ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। আরবসহ বিশ্বের অনেক সমাজে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। যার ফলে ধনী আরও ধনী হতো আর গরিব ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যেত। এটা ছিল শোষণের নামান্তর। তাই ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষণা করে। অনেকে সুদ ও মুনাফা বা লভ্যাংশকে সমরূপ মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদুটো এক নয়। কেননা সুদে লোকসানের কোনো ঝুঁকি থাকে না। আর মুনাফা বা লভ্যাংশে ঝুঁকি থাকে। সুদের সংজ্ঞা দিয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبٰوا

অর্থ : "যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তা-ই রিবা (সুদ)।" (জামি সগির)

ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ। যেমন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একশত টাকা এ শর্তে ঋণ দিল যে গ্রহীতা একশত দশ টাকা পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে একশত টাকার অতিরিক্ত দশ টাকা হলো সুদ। কেননা এর কোনো বিনিময় মূল্য নেই।

শুধু টাকা পয়সা বা মাল সম্পদ বিনিময়েই সুদ সীমাবদ্ধ নয়। বরং একই শ্রেণিভুক্ত পণ্যদ্রব্যের লেনদেনে কম-বেশি করা হলেও তা সুদের আওতাভুক্ত হবে। যেমন- এক কেজি চালের বিনিময়ে দেড় কেজি চাল নেওয়া কিংবা এক কেজি চাল ও অতিরিক্ত অন্য কিছু নেওয়াও সুদ হবে। মহানবি (স.) স্পষ্ট করে বলেছেন, "সোনার বিনিময়ে সোনা, রুপার বিনিময়ে রুপা, যবের বিনিময়ে যব, আটার বিনিময়ে আটা, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, এমনিভাবে সমজাতীয় দ্রব্যের নগদ আদান-প্রদানে অতিরিক্ত কিছু হলেই তা সুদ হবে।" (মুসলিম)

ঘুষ

ঘুষ অর্থ উৎকোচ। স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের কাজের জন্য নির্দিষ্ট বেতন-ভাতা পায়। কিন্তু তারা যদি ঐ কাজের

জন্যই অন্যায়ভাবে আরও বেশি কিছু গ্রহণ করে তা হলো ঘুষ। যেমন কারও কোনো কাজ আটকে রেখে তার নিকট থেকে টাকা পয়সা আদায় করা। অন্য কথায় অধিকার নেই এরূপ বস্তু বা বিষয় লাভের জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে অন্যায়ভাবে কোনো সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কিংবা নেওয়াকে ঘুষ বলা হয়।

সমাজে নানাভাবে ঘুষের প্রচলন দেখা যায়। সাধারণত মানুষ অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য টাকা-পয়সা ঘুষ দিয়ে থাকে। এ ছাড়া উপহারের নামে নানা দ্রব্যসামগ্রী যেমন, টিভি, ফ্রিজ, গহনা, ফ্ল্যাট ইত্যাদিও ঘুষ হিসেবে দেওয়া হয়। বস্তুত দ্রব্যসামগ্রী যে মূল্যমানেরই হোক, টাকা-পয়সা কম হোক বা বেশি হোক, ঘুষ হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা হারাম হবে।

কুফল ও পরিণতি

সুদ ও ঘুষ অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়। গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে ওঠে। পারস্পরিক মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। বরং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

ঘুষও মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব কর্তব্যে অবহেলা করে, আমানতের খিয়ানত করে। নিজ ক্ষমতা ও দায়িত্বের অপব্যবহার করে। ঘুষদাতা ও ঘুষখোর অন্য লোকের অধিকার হরণ করে। ফলে অধিকার বঞ্চিতদের সাথে তাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজে মারামারি-হানাহানির সূত্রপাত ঘটে।

বস্তুত সুদ ও ঘুষের অপকারিতা অত্যন্ত মারাত্মক। এটি সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ডেকে আনে। সুদ ও ঘুষের প্রভাবে মানুষ নৈতিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। বরং অসৎ চরিত্র ও মন্দ অভ্যাসের চর্চা শুরু করে। মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, অপচয় ও পাপাচারের প্রসার ঘটে। অনেক সময় সুদ-ঘুষের অতিরিক্ত অর্থের জন্য মানুষ নানা রূপ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে সমাজে জিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তার অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়। আর যে সমাজে ঘুষ লেনদেন প্রসার লাভ করে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়ে থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ)

আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সুদ ও ঘুষের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধর্মীয় দিক থেকেও এর কুফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ-ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ। আর হারাম কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যার শরীর হারাম খাদ্যে গঠিত, যার পোশাক পরিচ্ছদ হারাম টাকায় অর্জিত এরূপ ব্যক্তির কোনো ইবাদত কবুল হয় না, এমনকি তার কোনো দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারী যেমন মানুষের নিকট ঘৃণিত তেমনি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর নিকটও ঘৃণিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেন, লানত দেন। একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ

অর্থ : "নবি করিম (স.) সুদখোর, সুদ দাতা, সুদ চুক্তি লেখক ও সুদি লেনদেনের সাক্ষীকে অভিশাপ দিয়েছেন।" (মুসলিম)

নবি করিম (স.) অন্যত্র বলেছেন, لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ

অর্থ : "ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পাত।"(বুখারি ও মুসলিম)

সুদ ও ঘুষ লেনদেন করার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। এর ফলে মানুষ আল্লাহ তায়ালার শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় দুনিয়াতেও আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করেন। মহানবি (স.) বলেন,

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

অর্থ : "কোনো গ্রামে বা দেশে যখন জিনা ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপকতা লাভ করে তখন সেখানকার অধিবাসীদের উপর আল্লাহর আযাব আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে।" (মুসতাদরাকে হাকিম)

পরকালে সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীর স্থান হবে জাহান্নাম। কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি মহা শাস্তির সম্মুখীন হবে। সুদখোরদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদের মতোই।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫)

ঘুষখোরদের পরিণতি প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ

অর্থ : "ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামি।" (তাবারানি)

অন্য হাদিসে রাসুল (স.) ঘুষখোরদের অভিনব শাস্তির বিষয় বর্ণনা করেছেন। হাদিস শরিফে এসেছে, আয্‌দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবি করিম (স.) যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। তার ডাকনাম ছিল ইবনুল লুতবিয়্যা। সে (যাকাত আদায় করে) ফিরে এসে মহানবি (স.)-কে বলল, এই মাল আপনাদের আর এই মাল আমাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) মিম্বারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ প্রকাশ করার পর বলেন- যেসব পদের অভিভাবক আল্লাহ আমাকে করেছেন, তার মধ্য থেকে কোনো পদে আমি তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করি। সে আমার কাছে ফিরে এসে বলে, এগুলো আপনাদের, আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। এ ব্যক্তি তার বাবা-মায়ের ঘরে বসে থাকে না কেন? যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সেখানেই তো তার উপঢৌকন পৌঁছে দেওয়া হবে। আল্লাহর শপথ। তোমাদের কোনো ব্যক্তি অনধিকারে (বা অবৈধভাবে) কোনো কিছু গ্রহণ করলে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করতে করতে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। অতএব আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহর দরবারে এই অবস্থায় উপস্থিত হতে দেখতে চাই না যে, সে উট বহন করবে আর তা আওয়াজ করতে থাকবে অথবা গাভী (বহন করে নিয়ে আসবে আর তা) হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে অথবা বকরি (বোঝা বহন করে নিয়ে আসবে আর তা) ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত এত উপরে উঠালেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার হুকুম) পৌঁছে দিয়েছি? তিনবার তিনি এ কথা বলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

ইসলামের আলোকে সুদ-ঘুষের বিধান

ইসলামে সুদ ও ঘুষকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো অবৈধ, কোনো অবস্থাতেই সুদ-ঘুষের লেনদেন বৈধ নয়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط

অর্থ : "আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫)

অন্য আয়াতে এসেছে, "হে ইমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে

তোমরা সফলকাম হতে পারবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, "হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সুদের যা বকেয়া আছে তা ত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৮)

ঘুষের আদান প্রদানও হারাম বা অবৈধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে জেনেশুনে বিচারকদের নিকট পেশ করো না।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৮)

সুদ ও ঘুষ সর্বাবস্থায় হারাম। তা গ্রহণ করা যেমন হারাম তেমনি দেওয়াও হারাম। তেমনিভাবে সুদ দেওয়া ও সুদ নেওয়া উভয়টিই সমান অপরাধ। এমনকি সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকাও অপরাধ। রাসুল (স.) সুদি কারবারে বা সুদি লেনদেনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। বস্তুত সুদ ও ঘুষ খুবই জঘন্য অপরাধ। রাসুলুল্লাহ (স.) বহু হাদিসে মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন।

সুদ ও ঘুষের লেনদেন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এরূপ কাজ কখনোই করতে পারে না। আমরাও জীবনের সর্বাবস্থায় সুদ ও ঘুষের লেনদেন থেকে বিরত থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সুদ ও ঘুষের কুফল ও পরিণতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'তাযকিয়াতুন নাফস' কাকে বলে?

২. সংক্ষেপে সুদের অপকারিতা বর্ণনা কর ।

৩. গিবতের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. হিংসা কাকে বলে? হিংসার কুফল বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমানতের খিয়ানত করা কার চিহ্ন–

ক. ফাসিকের খ.কাফিরের

গ. মুনাফিকের ঘ. মিথ্যাবাদীর।

২. 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়'– বাণীটি কার?

ক. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর খ. হযরত আবু বকর (রা.)-এর

গ. হযরত উমর (রা.)-এর ঘ. হযরত আলি (রা.)-এর

৩. স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করতে হয়–

i. নিজের কাজ দ্বারা

ii. মুখের কথা দ্বারা

iii. সেবা দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রফিক সাহেব ও শফিক সাহেব একই অফিসে চাকরি করেন। রফিক সাহেব প্রায়ই শফিক সাহেবের আত্মসম্মানে আঘাত করে কথা বলেন।

৪. রফিক সাহেবের আচরণে কিসের অভাব পরিলক্ষিত হয়?

ক. ভ্রাতৃত্ববোধের খ. সম্প্রীতির

গ. সম্মানবোধের ঘ. আমানতের।

৫. রফিক সাহেবের আচরণের ফলে–

i. পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হবে

ii. অফিসের কাজের পরিবেশ নষ্ট হবে

iii. মনোমালিন্য লেগে থাকবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব 'ক' সরকারি চাকরি করেন। তিনি তার কর্মস্থলে জনসাধারণের কাজ করে দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে খুব আয়েশি জীবনযাপন করেন। তার ছেলে জনাব 'খ' বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে কর্মহীন জীবনযাপন করছেন। কেউ তাকে চাকরি খোঁজা বা কোনো কর্মে নিযুক্ত হওয়ার কথা বললে তিনি বলেন, কাজ করতে আমার ভালো লাগে না।

ক. আখলাকে 'হামিদাহ' অর্থ কী?

খ. দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কেন?

গ. জনাব 'খ' এর কাজটি ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "জনাব 'ক' এর কাজের পরিণতি ভয়াবহ"- মতামত দাও।

২. জনাব 'ক' তার বন্ধুদের সাথে গল্প করছিল। এর মধ্যে 'খ' বলল, জনাব 'ঘ'-কে তো দেখছি না। তৎক্ষণাৎ জনাব 'গ' বলল, আরে ওতো দুশ্চরিত্রের লোক। তাদেরই আরেকজন বলল, ওতো ৫০ কেজি চালের মূল্য নিয়ে আমাকে ৪৫ কেজি চাল দিয়েছে।

ক. আখলাকে 'যামিমাহ' অর্থ কী?

খ. ঘুষ গ্রহণকারীর সাথে ঘুষদাতা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে কেন?

গ. জনাব 'গ' এর কাজটি কীরূপ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব 'ঘ' তার কাজের জন্য অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে– মূল্যায়ন কর।